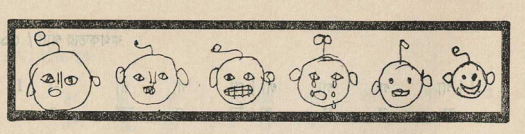

কথকদের কথা

কথকতার সমজদার অশেষজ্ঞ পণ্ডিত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি একবার লিখেছিলেন, 'গল্পের গুণ যদি চারি আনা, কথকের গুণ বার আনা।' কথকতার পুথি বা গান কথকের কণ্ঠেই জীবন্ত হয়ে ওঠে। শিল্পীরা কীভাবে তাদের সৃষ্টিকে বিচার করেন, কুন্তক যাকে বার বার বলেছেন, 'কবিব্যাপারঃ', সেটার ইঙ্গিত পাবার জন্য কথকদের জবানীর একটা সংকলন করা হয়েছে।

সোনামুখীর প্রয়াত কথক মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী মহাশয়কে সবাই রামঠাকুর বলে চিনতেন। শ্রীমতী বন্দনা সেনের বাল্য স্মৃতিতে রামঠাকুর উজ্জ্বল হয়ে আছেন। হাজরা রোডে গঙ্গাচরণ দাশগুপ্তের বাড়িতে সিঁড়ির ধাপিতে বাচ্চারা ঝাঁক বেঁধে মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তীর পাঠ শুনত, হনুমানের অঙ্গভঙ্গিতে তারা মজা পেত, শুনে অবাক হয়ে যেত রামের ডাকে অকালবোধনে দেবীর পূজার পুরোহিত রাবণ নিজে হয়েছেন। ব্যাখ্যার অভিনবত্ব ও অভিনয়কুশলতা ছিল মৃত্যুঞ্জয়বাবুর আসরের আকর্ষণ, বাঁকুড়ার সোনামুখী নিবাসী লছমন প্রসাদ নিজেও কথক। পিতৃব্যের জীবন ও কথকী রীতি নিয়ে তাঁর লেখাটা কথকতার একটি ধারা প্রসঙ্গে আমাদের অবহিত করতে পারবে। বাঁকুড়ার সোনামুখীর মনোহর তলায় থাকেন কথক শ্রী দ্বিজরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়। পিতৃদেব ফেলারাম বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে ও তাঁর দাদা রসময় বন্দ্যোপাধ্যায়-কে কথকতায় দীক্ষা দিয়েছিলেন। দ্বিজবাবুর জন্ম ২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩২ সালে তাঁদের, ঘরাণা আলাদা, রীতিও আলাদা। দ্বিজবাবু নিজে সেই কথা স্পষ্ট করে লিখেছেন। কলকাতার চালতাবাগান হরিসভায় দ্বিজবাবু বৎসরে পৌষ ও মাঘ মাসে একমাস ধরে কথকতা করেন, আমাদের জানত বর্তমানে কলকাতায় তাঁর এই আসরই নিয়মিত বসে, ঘড়ি ধরে শুরু হয়, একদিনও বাদ পড়ে না। দ্বিজবাবু ভালো করে জানেন যে তিনি একটি ধারার শেষ প্রতিনিধি। তাঁর পরই কথকতার এই পরম্পরায় 'পূর্ণচ্ছেদ' হবে।

চন্দননগরের ফটক গোড়ায় থাকেন শ্রীমতি ক্ষান্তিলতা দেবী ও তাঁর স্বামী ৯৪ বৎসরের বর্ষীয়ান কথক কুমুদবন্ধু ভট্টাচার্য পুরাণতীর্থ। ৭৫ বৎসরের বেশি বয়সে ক্ষান্তিলতা দেবী এখন আর আসরে যান না। জনসভায় প্রথম পেশাদার মহিলা কথকী হিসাবে আমরা বোধহয় ক্ষান্তিদেবীর কথা বলতে পারি। ২৮শে জুলাই, ১৯৯৩তে গৃহীত একটি সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে ক্ষান্তিদেবীর অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেছি। পড়তেন ক্ষান্তিদেবী, কিন্তু পালা লিখতেন স্বামী কুমুদবন্ধু। অধুনা দৃষ্টিহীন ভগ্নস্বাস্থ্য কুমুদবাবুও আমাদের সঙ্গে কথা বলেছেন ; সামাজিক প্রেক্ষাপট থেকে পালা লেখার চাতুর্য সব কিছু তিনি নিজের অননুকরণীয় ভঙ্গিতে বলেছেন। সেই সবের আভাসও সাক্ষাৎকারে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

কোন্নগরের মাস্টারপাড়ার বাসিন্দা শ্রীমতী বাসন্তী চৌধুরীর জীবন ও অভিজ্ঞতা স্বতন্ত্র। ১৯২০ সালে সোদপুরে তাঁর জন্ম, পিতা পশু চিকিৎসক নন্দলাল দত্ত, মাতা বীণাপাণি দেবী। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রীর বিবাহ হয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের অধ্যাপকের সঙ্গে, নিজেও হাওড়া গার্লস কলেজের অধ্যাপিকা ও সহ অধ্যক্ষা ছিলেন। রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়েও অধ্যাপনা করেন। গবেষণা করেছেন, বই লিখেছেন, সংকলকও বটে। 'অষ্টাদশ শতকে বাঙলার বৈষ্ণব সমাজ, সংগীত ও সাহিত্য', ১৯৬৮, 'ভাগবতের আলোকে বেদবাণী', 'দ্বাদশ ভাষণ' ইত্যাদি তাঁর গ্রন্থ। কথকের কোনরকম পরম্পরা থেকে তিনি আসেননি। অথচ কীভাবে ঘটনাচক্রে তিনি পাঠ ও কথকতার প্রথম সারির শিল্পী হয়ে উঠলেন এবং আন্তর্জাতিক স্তরেও তাঁর যাতায়াত শুরু হল, সেই অভিজ্ঞতার বিবৃতি তিনি নিজে লিখেছেন। ৭০ বৎসরের বেশি বয়স, এক চক্ষুতে দৃষ্টি নেই তবুও ডাক পড়লে আসরে যান বাসন্তী দেবী।

দেশজ ও আঞ্চলিক ধারায় জন্ম হলেও বর্তমান সময়ে কথকতার বিস্তার ও প্রচার কোনো ব্যক্তি বিশেষে, নির্দিষ্ট ঘরাণায় বা একান্ত ভৌগোলিক সীমায় আবদ্ধ থাকেনি। কথক বা কথকী নানা জাতের, নানা গোত্রের। তাই তাঁদের শিল্পবোধে ও অভিজ্ঞতায় ধরা পড়ে সপ্ত পদার্থের দুটি পদার্থই, সামান্য ও বিশেষ।

দ্বিজরাজের কথা

"ক থ ক তা"—কো নো বিষয়বস্তু সহজ সরল করে বোঝানোর পদ্ধতি। পূর্বে কথকতার যে স্টাইল ছিল, এখন সে রেওয়াজ নেই। দাশরথি রায়, শ্রীধর কথক, গদাধর শিরোমণি প্রমুখ সাধারণত গ্রাম্য পরিবেশে করতেন, কিন্তু বর্তমানকালে বিদ্বৎমণ্ডলীর কাছে, এ যুগের সঙ্গে সমতা বজায় রেখে কথকতা পরিবেশিত হয়। আমরা যেভাবে রামায়ণ কথকতা পরিবেশন করি, চিরাচরিত প্রথার থেকে তা একটু আলাদা। আমার স্বর্গীয় পিতা ফেলারাম বন্দ্যোপাধ্যায় আমার শিক্ষাগুরু। তাঁর কাছেই আমার কথকতা শিক্ষা। ছেলেবেলায় আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীরসময় বন্দ্যোপাধ্যায়ও আমাকে পদ্য ছন্দে কথা বলা অভ্যাস করাতেন। যেমন একটা পয়ারের প্রথম চরণ দাদা বললেন;—যাহা কর ভেবে কর করে ভাবিও না। আমি বললাম,—ভাবিয়া করিলে কাজ বিফল হবে না। এইভাবে আমরা পদ্য ছন্দে কথা বলা অভ্যাস করতাম। এখন আমরা রামায়ণ কথকতা পরিবেশন করার সময় কোনো কবির বাঁধা পয়ার সাধারণত বলি না। কিছু ত্রিপদী, পয়ার যা মহানাটকের শ্লোক মুখস্থ করতে হয়েছে অবশ্য। তা ছাড়া বাবার রচিত গান কথকতায় সংযোগ করি। আগেকার দিনে কথকতা পরিবেশিত হতো গ্রাম্য পরিবেশে ২০/৫০ জন শ্রোতার সামনে। কিন্তু ইদানিংকালে শহরে উচ্চশিক্ষিত মহলে ৪/৫ হাজার শ্রোতার সামনে পরিবেশিত হয়। আমাদের সোনামুখীর মনোহর তলায় শ্যামসুন্দর জীউর মন্দিরে ছেলেবেলায় বাবা পুঁথি পাঠ করতেন। একদিনের ঘটনা মনে পড়ে। সেদিনের উপাখ্যান "সীতাহরণ" বাবা পুঁথি পাঠ করছেন, দাদা তন্ময় হয়ে শুনছেন। প্রতিটি শ্রোতার চোখে জল। যখন বাবা বর্ণনা করছেন, রাবণ বলছে, 'শোন সীতা, ভালো কথায় রাজি যখন হলে না, এবার আমি বল প্রয়োগ করতে বাধ্য হচ্ছি' এই বলে যোগীমূর্তিধারী রাবণ যেমন সীতাদেবীর কেশাকর্ষণ করেছে, দাদা তখন তাঁর কাছে একটি মন্দিরা ছিল, সেটি বাবার দিকে তাক করে ছুড়েছিলেন, সামলে না নিলে বাবার মাথা ফেটে যেত। এমন মোহ কথকতার দ্বারা সৃষ্টি করেছিলেন, দাদা মনে করেছিলেন, বাবাই রাবণ। আর একবারের কথা মনে আছে, বাবার রামায়ণের দল ছিল। তাতে দাদা, আমি সহযোগিতা করতাম।

হৃদয়পুরে এক পণ্ডিত মশাইয়ের বাড়িতে গান হচ্ছে।
বিষয় "হরিশ্চন্দ্র", এমন পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, 'রোহিতাশ্বের মৃতদেহ বুকে নিয়ে শৈব্যা চলেছে শ্মশানে' ঘনঘটাচ্ছন্ন মেঘ আকাশে, মাঝে-মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। শৈব্যা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলছে :
'বাপরে আমার !! বাছারে আমার !!' এই দুটি কথা বলেই বাবা এমন ভাবে বিভোর হয়ে পড়লেন,—যে, আর কোনো কথাই বলতে পারলেন না। কথা বলতে গেলেই কান্না আসছে, গান বন্ধ হয়ে গেল। শ্রোতারাও এমন শোকাবিহ্বল, যে তাঁরাও আর শুনতে পারলেন না। আমরা যে ভাবে কথকতা করি প্রাচীন ধারাবাহিকতা থেকে তা সম্পূর্ণ পৃথক। মূল বাল্মীকিকে বজায় রেখে কৃত্তিবাস, রঘুনন্দন গোস্বামী, তুলসীদাস প্রমুখ থেকে গৃহণীয় ভাবগুলি নিয়ে, মহাজনী গান, তুলসীদাসী ভজন, বাবার স্বরচিত গান, শ্লোক সংযোগ করে বিশেষ ভঙ্গিতে পরিবেশন করি। অভিনয়াংশ কিছু থাকে। তবে স্বরসংবৃত্তি (যা কেহ-কেহ আজকাল করছেন, এতে মৌলিকত্ব ক্ষুণ্ণ হয়, যেন বাবাকে পিসেমশাই বলা) করি না। আমার কথকতা-জীবনের দীর্ঘ ৪০ বছরে এটুকু বুঝেছি, সমাজ শিক্ষা, গার্হস্থ্য শিক্ষা, লোকশিক্ষার অন্যতম প্রধান মাধ্যম এই "কথকতা"।
প্রাচীন ধারা থেকে পরিমার্জিত পরিবর্ধিত হতে-হতে কথকতা আজ যে পর্যায়ে এসেছে ; তা থেকে এটুকু বলা যায়, মানব জীবনে, সমাজ জীবনে "কথকতা" একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ। □

কুমুদবন্ধু ভট্টাচার্য মহাশয়ের কথা

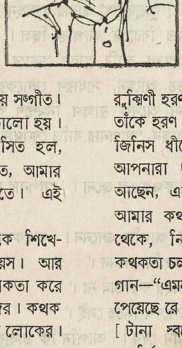

নড়াইল জমিদার রতন রায়ের নাম শুনেছেন? ওদের সভাপণ্ডিত ছিলেন অক্ষয়কুমার স্মৃতিতীর্থ। তাঁর বাড়ির কাছে আমার বাড়ি, তাঁর কাছে আমি সংস্কৃত শিখেছি। আমার বাবা রামায়ণ গাইতেন, নাম শ্রীসাধনচন্দ্র ভট্টাচার্য। বড় গাইয়ে ছিলেন। আমার বংশপরম্পরায় সঙ্গীত। সঙ্গীত বংশপরম্পরায় হলে ভালো হয়। আমাতে সে সঙ্গীত পর্যবসিত হল, আমার থেকে আমার ছেলেতে, আমার ছেলে থেকে আমার নাতনীতে। এই শেষ, আর গান হবে না।

কথকতা কথকের মুখ থেকে শিখেছিলাম। আমার ৯৫ বৎসর বয়স। আর সুর ওঠে না। তা নাহলে কথকতা করে শোনাতাম, জিনিসটা কি সুন্দর। কথক হবার উপায় নেই অন্য কোনো লোকের। কথক হতে গেলে সংস্কৃত জ্ঞান থাকা চাই ভালো, বাংলায় জ্ঞান থাকা চাই ভালো, বাংলায় বক্তৃতা ও ভাষায় অধিকার থাকা চাই ভালো, নানারকম সঙ্গীতে অধিকার থাকা চাই, কখনো বাউল, কখনো ভাটিয়ালি, কখনো ভৈরবী, কখনো মালকোষ—

এমনিতে কথক হবার উপায় নেই, কথকতায় কর্তাদিকে যে জ্ঞান থাকা চাই, আপনার সঙ্গে কথা কইছি, হঠাৎ সুর দিয়ে মাধুর্য ফুটিয়ে তুললাম। কথকতার ভিতর সব আছে। ভাষায় দখল না থাকলে কথক হবে না। অভিনয়, গলার স্বর সব আছে। পালা সাজাতাম যেমন রুক্মিণী হরণ। রুক্মিণীর জন্মবৃত্তান্ত, তাঁর পিতার নাম, কোথায় বাড়ি, তারপর ক্রমশ ক্রমশ রুক্মিণীর চরিত্রটা, রুক্মিণী হরণ কী করে হল, কৃষ্ণ কী করে তাঁকে হরণ করে নিয়ে এলেন, এই সব জিনিস ধীরে ধীরে পরিষ্কার করে—আপনারা দশ হাজার এখানে বসে আছেন, একমনে শুনবেন আপনারা আমার কথকতা। ওসব আমার মন থেকে, নিজে তৈরি করা। যেমন কথকতা চলছে:

গান—"এমন সাধের মানব জনম
পেয়েছে রে মন ভগবানের কৃপায়"

[টানা স্বরে]—তদনন্তর দেখা গেল দেবর্ষি নারদ আগমন করিতেছেন। এক্ষণে সময়ে শোনা গেল দেবর্ষি নারদ বীণা বাজিয়ে তাঁর বীণার তন্ত্রীতে গুণগুণ সঙ্গীত আলাপন করিতে করিতে ব্রহ্মলোক হইতে দ্বারকা নগরে উপস্থিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ চরণে প্রণাম পূর্বক বলিলেন, 'প্রভো আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করব।' [টানা স্বর শেষ] এই যে কথকতার ঢঙ, এ নাহলে হবে না···[টানা স্বর আবার শুরু] ভগবান বলেছেন নারদ

কথং তে সমাগমঃ ? কথৈব ? সব কুশল আছে ত ? এখন তুমি কোথা থেকে এসছ ? ব্রহ্মলোকাৎ আগতম্। আমি ব্রহ্মলোক থেকে আসছি। আপনার শ্রীচরণ দর্শন করবার জন্য আমি এখানে এসেছি। সুরে গান

"একবার কৃপা কর মোর হৃদয়ে
ধন্য হব তোমার কৃপা দানে"

[টানা স্বর শেষ]

[মাঝে] ক্ষান্তিদেবী বলেন—'যা কিছু ওঁর মন থেকেই। শাস্ত্র থেকে নিয়েছেন, হয়ত ভাগবতের শ্লোক নিলেন, রুক্মিণী হরণে ভাগবতের যে শ্লোক আছে, শ্লোকগুলো নিলেন, তারপরে শ্লোকের ব্যাখ্যা মন থেকে তৈরী করে সুন্দর করে সাজিয়েছেন। তার সঙ্গে গান, গানও নিজের রচনা, সুর, ভাষা, সব নিজের।'

[কুমুদবন্ধু আবার বলছেন]

মহিলা কথক হিসাবে ওনার বিরুদ্ধে আপত্তি ছিল। একটা ঘটনা বলি। জেমো রাজবাড়িতে সভাপণ্ডিত, বেতের লাঠি হাতে চেয়ারে বসে আছেন। পাশে উঠানে অনেক লোক, অনেক পণ্ডিত আছেন, সাধারণ লোকেরাও আছে। রাণীমার একটা ব্রত প্রতিষ্ঠা ছিল, সেইজন্য অনেক ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করে আনা হয়েছিল। আমি যেতেই আমাকে জিজ্ঞেস করছেন, 'আপনার বাড়ি কোথায় ?'

—'আমার বাড়ি চন্দনগর।'

—'এখানে আপনি এসেছেন কথকতার জন্যে। আপনার স্ত্রী কথকতা করেন ?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'স্ত্রী জাতির অধিকার নেই আপনি জানেন। কথকতায়, ভাগবতে, বেদে, পুরাণে, স্ত্রী জাতির অধিকার নেই, আপনি জানেন।'

—'না জানি না, জানলে বোধহয় করাতাম না।'

—'স্ত্রীজাতির কাছ থেকে উপদেশ নিতে নেই।'

—'আপনার কথার জবাব আমি দেব। আপনি কি ভাষায় কথা বলেন ?'

—'বাংলা ভাষায়।'

—'বাংলা ভাষাটা কোন ভাষা ? আপনার মাতৃভাষা।'

—'হ্যাঁ হ্যাঁ আমার মাতৃভাষা।'

—'দেখুন মায়ের মুখ থেকে আপনি যে ভাষা শিখেছেন, সেটাই হল আপনার মাতৃভাষা। যদি স্ত্রীলোকের মুখ থেকে শুনতে নেই, শিখতে নেই, আপনার মা ত' স্ত্রীলোক ছিলেন না ?'

মশায় সমস্ত লোক আমার হয়ে গেল।

"দেখুন একটা কথা বলি। মায়ের মুখ থেকে আপনি বাবা চিনেছেন। যখন আপনি তিন-চার বছরের বালক তখন আপনি 'বা' 'বা' করে বেড়াতেন। রাস্তায় লোক যাচ্ছে, মা এসে বললেন, 'হ্যাপ বাবা কাকে বলছিস্, এই তোর বাবা', মা বাবাকে চিনিয়ে

দিয়েছেন, তবে আপনি বাবা চিনেছেন।"...ওর সব লোক আমার দিকে চলে এল।
কথকতাটা শেখাতাম কি করে জানেন? ও বসত, আমি কথকতা করে যেতাম। ও সুরটা টেক করে তুলে নিতে পারত। মিষ্টভাষিণী, ও যে কোনো সুরে গাইতে পারে। কথকতায় সব রকমের সুর চাই, ভাটিয়ালি চাই, টপ্পা চাই, কীর্তন চাই, খেয়ালটা খালি বাদ।
কখনো একসঙ্গে কথকতা করিনি। ও হচ্ছে আপনার স্ত্রী ও শিষ্যা। ও আমার মুখ থেকে কথা নিত, তাহলে আমি অপমান বোধ করতুম। ও যদি কথা বলতে বসে, আমি ওর মুখ থেকে কথা নিয়ে নিতুম, লোকেরা তখন বলবে, এর কথকতার ভুল হচ্ছে বা ত্রুটি আছে, ইনি সেই ত্রুটিটা সেরে দিচ্ছে।
আমার গুরু হচ্ছেন প্রভুপাদ রাধাবিনোদ গোস্বামী। গুরুর কৃপা না হলে কিছু হয় না। ওঁর কৃপালব্ধ যে সব জিনিস আমি পেয়েছি, আমি পরিবেশনা করেছি। □

ক্ষান্তিলতার কথা

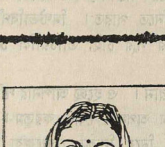

আমার জন্ম চন্দননগরে। বাবার নাম শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মায়ের নাম শ্রীমতী প্রমীলাবালা দেবী। বিয়ে হয়েছে আমার এখানেই। শ্বশুরবাড়ি যাইনি কখনও। কারণ শ্বশুরবাড়ি খুলনায়। উনি (স্বামী) অনেক ছোটবেলাতেই এখানে চলে এসে-ছিলেন। বহু জায়গাতে উনি ঘুরে-ঘুরে বেড়াতেন। ঘুরতে-ঘুরতে আমাদের পাড়াতেই আছে বোসেদের বাড়ি—সেখানে কী একটা কাজে এসেছিলেন। আমার মার এসব বিষয়ে (ধর্মীয় আলোচনা, পাঠ ইত্যাদি) জানবার শুনবার খুবই আগ্রহ ছিল। আমার মা ছিলেন একটু সাধিকা। মা সাধন-ভজন এসব বিষয়ে অনেক কিছু লিখতেন। অনেক গভীর-গভীর বিষয়ে আলোচনা শুনতে যেতেন। এরজন্য উনি (মা) অনেক সাধু মহাপুরুষের সঙ্গলাভ করেছেন। এই আগ্রহ থাকার জন্য মা ওখানে (বোসেদের বাড়ি) আলোচনা শুনতে যান—সেখানে ওনাকে দেখে এবং কথা শুনে মায়ের ছেলের মতো ভাল লাগল। মা বললেন, 'বাবা, আমাদের বাড়িতে যেও' ইত্যাদি। মায়ের সঙ্গে ওনার যোগাযোগ হল, ভাল মতো আলাপ-আলোচনা হল। তারপর মা মাঝে-মাঝেই ওখানে ওনার পাঠ শুনতে যেতেন। উনি মাকে (আমার) 'মা' বলে ডাকতেন। এরপর উনি আমাদের বাড়িতে এলেন। অনেকদিনের কথা সেসব। তখন আমার বয়স বারো / তের।

ওনার সঙ্গে আমাদের বাড়ির যোগাযোগ হল। ওনার মনে অনেক দিনের ইচ্ছে কিছু একটা তৈরি করবেন। কিন্তু সেরকম কিছু না পেলে তৈরি কী করবেন?

আমি তখন সংস্কৃত পড়ছি। আমাদের চন্দননগরেই টোল — কালিদাস চতুষ্পাঠী। সেখানেই পড়ি। আমাদের পণ্ডিত মশায়ের নাম ছিল রামরতন বেদান্তরত্ন। তাঁর কাছেই সংস্কৃত পড়েছি। সপদ্যে ব্যাকরণের আদ্য-মধ্য পরীক্ষা দিয়েছি। মায়ের সঙ্গে ওনার যোগাযোগ ছিল। মা ওনাকে বললেন—'আমার মেয়ে শিক্ষিতা—সংস্কৃত পড়েছে। ওকে একটু দেখ। আমি তখন চন্দননগরে হরিশ্চন্দ্র মহাশয়ের স্কুলে থিতে পড়ছি। ওনার সঙ্গে আমার যোগাযোগ হল। উনি তখন মাকে বললেন—'ওকে স্কুল ছাড়িয়ে দিন। আমি একটা অদ্ভুত জিনিস তৈরি করব। আমার মায়ের বরাবরই আগ্রহ ছিল — মেয়েরা স্বাবলম্বী হোক। তৈরি হোক, নিজেরা

উপার্জন করতে সক্ষম হোক। সেই সময় আমার বাবার চাকরিটাও চলে গেল। বাবা 'কলকাতা গুড্‌স্' (মালগুদাম)-এ চাকরি করতেন। হঠাৎ বাবার চাকরি চলে যাওয়াতে আর্থিক অনটনে সংসারের অবস্থা বেশ অচল হয়ে আসছিল। তখন ঠিক আয়ের জন্য না হলেও আমাকে শেখানোর বা তৈরি করানোর জন্য ওনার সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। উনি বললেন, 'আমারও তো সেই ইচ্ছে।'

উনি এর আগে কথকতা করতে একলা-একলা অনেক দেশে-দেশে ঘুরেছেন। তখন ওনার বয়স অল্প ছিল। এরপর উনি আমাদের এখানেই পাকাপাকিভাবে এলেন। বিবাহ হল।

আমার থেকে দু-বছরের বড় আমার দিদি—হেমলতা দেবী তাঁর সঙ্গে ওনার প্রথমে বিবাহ হয়। দিদিও সংস্কৃত পাশ করেছে—খুব মেধাবী ছিলেন। উনি তাকেই প্রথমে শেখাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু দিদির শরীর হঠাৎ খুব খারাপ হয়ে গেল (বরাবরই ক্ষীণ ছিলেন)। তার ওপরে গলায়ও তেমন সুর আসছিল না।

আমি স্কুলে গানেতে বরাবর ফার্স্ট হতাম। স্বাস্থ্যও বেশ ভাল ছিল। গলাও সুরেলা ছিল। সেইসব কারণে উনি আমাকেই শেখাতে শুরু করেন। তখন আমার বয়স খুবই অল্প। আমার জন্মসনটা ঠিক মনে নেই। এখন আমার বয়স সাতাত্তর / আটাত্তর।

যাই হোক, উনি আমাকে শেখাতে লাগলেন আর আমাকে নিয়ে (পাঠ করানোর জন্য) এখানে-ওখানে যাওয়া শুরু করলেন। সঙ্গে আমার মা-ও যেতেন। আমাদের এক গুরুমা—যিনি আমাদের দীক্ষা দিয়েছেন তাঁকে গিয়ে উনি বললেন—'মা, আপনি দেখুন কেমন তৈরি হয়েছে। সর্বপ্রথম সেখানে নিয়ে গেলেন। সেদিন গ্রহণ ছিল। বোধহয় চন্দ্রগ্রহণ। গুরুমার বাড়িতে গিয়ে সেইদিন আমি প্রথম পাঠ করলাম। বয়স তখন আমার তের। তের / চোদ্দ বছর বয়স থেকেই আমি পাঠ আরম্ভ করি। তবে তা খুবই সামান্য। দু-এক জায়গায় অল্প-স্বল্প যেতাম। বয়স অল্প। খুব ভয় করত, আবার লজ্জাও হতো খুব। উনি অবশ্য সবসময় সঙ্গে থাকতেন। কিন্তু উনি পাঠ করতে পারতেন না তখন। ওনার বুকে একবার প্লুরিসিস হয়—সেইসময় থেকে আর পাঠ করতে পারতেন না আসরে। ওনার এজন্য তখন একটা কষ্ট ছিল—এত সুন্দর জিনিসটা হারিয়ে যাবে, নষ্ট হয়ে যাবে? আমি কাকে দিয়ে যাব। আমার মায়েরও খুব ইচ্ছে ছিল ওনার এত সুন্দর জিনিসটা যেন নষ্ট না হয়, কারও মধ্যে থেকে যাক। মা বললেন, 'আমার মেয়েকেই শেখাও।' উনি সানন্দে শেখালেন।

শিখছি আবার এখানে-ওখানে যাচ্ছি। উনি সবসময় আমার সঙ্গে থাকতেন। ওনার কাছে বসে আমাকে শিখতে হতো, পাঠ করতে হতো। সেইসময় অনেকে চিন্তা করলেন—এইভাবে দেশে-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো হয়তো ঠিক হচ্ছে না তার থেকে এদের বিবাহ হলে সর্বদিক থেকে ভাল হয়। সকলের এবং দিদিরও ইচ্ছেতে বা সকলের

মতামতেই আমাদের বিবাহ হয়। বিবাহের পরও বাইরে পাঠ করতে যাওয়ার সময় আমাদের দুজনের সঙ্গে মা-ও থাকতেন বেশির ভাগ সময়েই।

বহু দেশ ঘুরেছি। বলতে গেলে সারা ভারত। তবে দক্ষিণ ভারতে যাইনি। ভাগলপুর, জামালপুর, মুঙ্গের, এলাহাবাদ, প্রয়াগ, কাশী, মান্দার হিল কোথায় না গেছি! এদিকে আবার লালগোলা। লালগোলা মহারাজার বাড়ি। এক-একটা জেলায় গেছি, এক বছর করে থেকেছিও কোথাও কোথাও। যেমন মালদহ-বহরমপুরে একবছর করে ছিলাম। কুচবিহার-দিনাজপুর কোথায় না গেছি। জেলায়-জেলায় আর তার গ্রামে-শহরে বহু ঘুরেছি।

আমাকে কারা ডাকত—এর উত্তরে বলা যায়, ডাকত অনেকেই। অনেক সভা-সমিতির লোকজনেরা। ধর্মসভা, কোনো উৎসব-অনুষ্ঠান গ্রামে বা কারও বাড়িতে অনুষ্ঠিত হলেই আমার ডাক পড়ত। এসে বলতেন কেউ-কেউ 'আমাদের গ্রামে অমুক দিনে অমুক তারিখে একটা উৎসব আছে পারবেন তো যেতে?' আবার এমন হয়েছে কোনো এক জায়গায় পাঠ করছি—অন্য আর এক জায়গার লোক সেই পাঠ শুনলেন—ভাল লাগল তাঁর। তখন উনি ওনার জায়গায় গিয়ে এইরকম একটা আসরের আয়োজন করলেন। তখন আমার বয়স পনেরো / ষোলো অথবা সতেরো।

আমার যখন সতেরো বছর বয়স তখন আমার প্রথম সন্তান (ছেলে) হয়। তার গর্ভাবস্থায়ও আমি নানা জায়গায় পাঠ করে বেড়িয়েছি। ছেলের পাঁচ-ছয় বছর পর্যন্ত ওকে সঙ্গে নিয়ে পাঠ করতে গেছি। ছেলের সাত বছর বয়সের সময় আমার বাপের বাড়ির পাশেই আমার বড় ভাজেরা থাকতেন তাঁর কাছে ওকে রাখলাম। বললাম—'ওকে তোমাদের কাছে রেখে স্কুলে ভর্তি করাও, লেখাপড়া শেখাও আমার সঙ্গে ঘুরে বেড়ালে তো পড়াশুনা কিছুই হবে না।'

কত জায়গায় গেছি। রাজা-রাজড়াদের বাড়ি যেমন গেছি আবার খুব সাধারণ লোকের বাড়িও গেছি। হরিসভা, দোল উৎসবে গেছি আবার ছেলের জন্মতিথি, অন্নপ্রাশন, গৃহপ্রবেশ, শ্রাদ্ধবাসর থেকে ডাক আসত সেখানেও গেছি। কোনো বাড়িতে সাতদিন ধরে রাসলীলার উৎসব হয়েছে, সেখানে পরপর সাত দিন ধরেই থেকেছি তাদেরই সঙ্গে—তাদেরই বাড়িতে। তারাই থাকা-খাওয়ার বন্দোবস্ত করতেন।

তের বা চোদ্দ বছর বয়স থেকে প্রায় একটানা ষাট / পঁয়ষট্টি বছর বয়স পর্যন্ত ঘুরে-ঘুরে পাঠ করে গেছি। যখন আমি হাজারিবাগ, জামশেদপুর-টাটা গেলাম, তখন একনাগাড়ে বিরামহীনভাবে পাঠ করেছি। একদিনও বিশ্রাম করতে দেবে না লোকজনেরা। এতটাই তাদের আগ্রহ। আমার নোটবুকে কবে কোথায় পাঠ ইত্যাদি লিখে রাখতাম। আবার বিশ্রামের দিন কবে তাও লিখতাম। তাও লোকেরা পাগল করে দিত—সব জায়গাতেই যেতে হবে। আমি বলতাম—'একদিনও আমার খালি নেই', ওরা এসে অনুনয়-বিনয় করে বলতেন, 'যেতেই হবে আপনাকে' তারপর তাঁরা আমার নোটবুক নিয়ে বিশ্রামের দিনটাকে দেখিয়ে বলতেন, 'এই দিনে আমাদের

ওখানে যেতেই হবে।' এইসবগুলো সেইসময় ছিল। তবে সত্যি বলতে কি এত গান করে বেড়িয়েছি কিন্তু একদিনও গলা খারাপ হয়নি। একদিনে পাঁচ / ছয় ঘণ্টা পাঠ করেছি। গলা এত ভাল ছিল যে একদিনে দু-জায়গায় পাঠ করেছি দু-আড়াই ঘণ্টা ধরে। বিকেল পাঁচটা থেকে কথকতা করতে শুরু করলাম কোনো আসরে সাতটা-সাড়ে সাতটা পর্যন্ত করলাম। সেখানে একটু কথাবার্তা বলে বাড়ি গেলাম। জপ-তপ-সন্ধ্যা-আহ্নিক সেরে একটু চা খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম অন্য এক আসরের উদ্দেশ্যে। সেখানে সাড়ে সাতটা অথবা আটটা থেকে দশটা / সাড়ে দশটা পর্যন্ত পাঠ করলাম। এইভাবে পাঠ করেছি তখন।

এদিকে কলকাতার বোধহয় এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে না পাঠ করেছি। ওদিকে উত্তরপাড়া, শ্রীরামপুর, শেওড়াফুলি, বৈদ্যবাটী, সোদপুর, আগরপাড়া, খড়দহ কোথায় না। এসব এক-একটা জায়গা এমন ছিল বছরের কোনো নির্দিষ্ট উৎসবের দিনে যেতেই হবে। সোদপুর থেকে সেদিনও এসেছিলেন ওদের এক আসরে পাঠ করার আর্জি নিয়ে। বাঁধা আসর ব্যাপারটা কথকদের থাকেই। বাঁধা আসর বলতে এ বছর এক জায়গায় গেয়ে এলাম আবার সেদিনই ঠিক হয়ে যেত আগামী বছরে ওই দিনেই গাইতে যেতে হবে ওখানে।

উনি কাউকে আলাদা শিখিয়েছেন কিনা বললে বলতে হয়—সেভাবে কেউ আসেনও নি আবার উনিও সেভাবে শেখাননি। এ ব্যাপারটায় ব্রাহ্মণদেরই একমাত্র অধিকার এমন কোনো কথা নেই। তবে কথকতা করতে গেলে অনেক বিষয়েই অভিজ্ঞ হতে হবে। অর্থাৎ সংস্কৃতের জ্ঞান থাকা চাই, সংস্কৃত উচ্চারণ ভাল হওয়া চাই, গানের জন্য সুরেলা কণ্ঠ দরকার, গানের বিষয়ে অর্থাৎ রাগের বিষয়ে জ্ঞান থাকা চাই। এতসব বিষয় থাকলেই কথকতা করতে পারা যায়। লেখা-পড়ার চর্চাটাও খুব প্রয়োজনীয়।

তবে ওনার কাছে যদি কেউ আসত তাকে তিনি আগ্রহভরেই শেখাতেন। অবশ্য একবার একটি মেয়ে এসেছিল। আমাদের এখানকার হাটখোলা গোন্দলপাড়ার মেয়ে। নাম সুধা মুখার্জি। সংস্কৃত ভাল না জানলেও বলতে পারত একটু-আধটু। গানের গলা বেশ ভাল ছিল, উচ্চারণও ভালই করত। উনি তাকে শিখিয়েছিলেন। দু-এক জায়গায় মেয়েটি পাঠও করেছিল। কিন্তু মেয়েটি হঠাৎই ক্যানসারে মারা যায়। তারপর আর কাউকেই উনি শেখাননি।

কথকতা-টা আসলে কী? কথকতায় গান জানা জরুরি, পাঠেরও বিশেষ ভঙ্গি আছে সেটা শিখতে হয় এবং সবচেয়ে যেটা প্রয়োজন যে বিষয়টা পাঠ করবে তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওয়া। এটা একটা রসের, একটা ভাবের ব্যাপার।

উনি প্রচুর গান লিখেছেন। আমি ওনার লেখাই পাঠ করতাম। উনি যা-যা লিখতেন, পাঠের সময় সামনে রেখে সেটাই পাঠ করতাম। উনি গানে সুর দিতেন, রাগ-রাগিণী নিয়ে আলোচনা করতেন—আর উনি যেভাবে যেভাবে বলতেন আমি ঠিক সেইভাবেই তুলে নিতাম এবং আসরে গিয়ে উপস্থাপিত করতাম। এমন অনেক দিন গেছে শ্রোতারা

একটা বিশেষ কিছু শুনতে চায় কিন্তু লেখা নেই—উনি সকাল থেকে লিখে যেতেন—আর আমি পাশে বসে থেকে পড়ছি—করছি, তারপর বিকেলে আসরে ওই নতুন জিনিসটাই উপস্থাপন করতাম। আমি ঈশ্বরকে মানি। তাঁর অসীম করুণা আমার ওপর না থাকলে এইরকম করা যায় না। ভাবলে খুব অবাক লাগে নিজেরই।

লোকে যেভাবে গানের রেওয়াজ করে আমি সেভাবে কোনোদিন করিনি। স্কুলে গানের ক্লাস ছিল। পুরো গানটা শিখতাম—গাইতাম প্রাইজও পেয়েছি। আর গানের গলাটা ভাল ছিল। উনি গানটা বলতেন, সুর দিতেন। আমি শুনে তখনই গলায় তুলে নিতাম। ওনাকে শোনাতাম। শুনে ওনার যে জায়গাটা ঠিক লাগত না সে জায়গাটা ঠিক করে দিতেন—তারপর নিজে করে বলতেন এইভাবে গাইতে হবে। আমি করতাম। পাঠের পদ্ধতিও কী হবে, কখন কীভাবে হাত নাড়তে হবে উনি সবকিছুই করে দিতেন—আমি আসরে গিয়ে সেইভাবে করতাম। উনি সবসময় আমাকে বলতেন—'যখন যে চরিত্রটা পাঠ করবে, মনে করবে তুমিই সেই। যেমন যখন ব্যাসাসনে বসবে তখন মনে করবে তুমিই স্বয়ং ব্যাস। সামনে যে শ্রোতারা থাকবে তাদের কখনওই ভয় পাবে না।' বাস্তবিকই আমিও পাঠ করতে গিয়ে কেমন একটা শক্তি পেতাম। প্রথম-প্রথম অবশ্য ভয়-লজ্জা দুটোই ছিল, তখন চোখ বুজে পাঠ করতাম। পরে অভ্যস্ত হয়ে গেলাম। ভয়-ভীতি সরে গেল, আমিও স্বচ্ছন্দ হলাম। শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধবৎ পাঠ শুনতেন, আসরে টুঁ শব্দটি হতো না। আসরে সবরকম মানুষজন আসতেন। সব বয়সের পুরুষ-মহিলা, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সবাই। এক-একটা আসরে লোক উপচে পড়ত, পাঁচ হাজার, দশ হাজার লোক হামেশাই হতো।

আমার জনপ্রিয়তা তখন এমন ছিল যে, আমাকে বাদ দিয়ে কথকতার আসর বা কোনো উৎসব হতো না। তরুণকান্তি ঘোষ মহাশয় আমার গানের খুব ভক্ত ছিলেন। তাঁদের দোলযাত্রা উৎসব হতো, নানা আসরও হতো। উনি আমাকে আসরে ডাকতেন। স্বামী নিখিলময়ানন্দকে পাঠাতেন। তিনি এসে আমাকে বলতেন, 'মা, আপনাকে তরুণ যেতে বলেছে, আরও বলেছে ক্ষান্তিলতা না থাকলে আসরে লোকই হবে না'। গর্ব না করেই বলছি কোনো আসরে আমার গান আগে থাকলে শ্রোতারা আমারটা শুনেই চলে যেতেন—আসর ফাঁকা হয়ে যেত। সেইজন্য আমাকে সবসময়ই পরে দেওয়া হতো। আবার এমনও হয়েছে আমি পরে গাইব বলে অনেক শ্রোতা আগে না এসে আমার সময়ে উপস্থিত হতেন।

আমার পারিশ্রমিকের কথা বলতে গেলে বলতে হয়—প্রথম আমি শুরু করি পাঁচ টাকা দিয়ে, তারপর দশ টাকা, তারপর দীর্ঘদিন আমি একান্ন টাকার পারিশ্রমিকে পাঠ করেছি। কলকাতায় যখন পাঠ করেছি তখন একান্ন টাকাতেই বেশি করেছি। কলকাতাতে, দক্ষিণেশ্বরে, আদ্যাপীঠে সমস্ত জায়গাতেই ওই একান্ন টাকা। শেষের দিকে অবশ্য পারিশ্রমিকটা একশ এক টাকায় নিয়ে যাই। লালগোলার রাজবাড়ি, বহরমপুরে রাজা কমলচন্দ্র রায়ের বাড়ি এইরকম তৎকালীন অনেক রাজবাড়িতে পাঠ

করেছি অনেকবার। উড়িষ্যা রাজ্যের কয়েকটি রাজবাড়িতে গেছি। আজ আর সব ভালভাবে মনে নেই। পুরীতে বেশ কয়েকবার গেছি—পাঠও করেছি তবে ভুবনেশ্বরে পাঠ করিনি।

শ্রোতারা নানা ধরনের ছিলেন, তবে সাধারণ মানুষজনই বেশি—পুরুষের সংখ্যা অনেক থাকলেও মেয়েদের সংখ্যা ছিল তার থেকেও বেশি। এই বেশি হওয়ার কারণ হিসেবে আমার মনে হয়, মেয়েদের সংসারে অনেক দুঃখ, জ্বালা-যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। তার থেকে কিছুক্ষণ মুক্তি পাওয়ার জন্য, শান্তি পাওয়ার জন্য দু-আড়াই ঘণ্টা তন্ময় হয়ে বসে পাঠ শুনতেন। ওটাই তাঁদের অনেক পাওয়া। শুধু গরীব বা দুঃস্থ পরিবারের মেয়েরা শুনতে আসত তা নয়, ভাল পরিবারের অর্থাৎ শিক্ষিত, উচ্চবংশীয়, গৃহস্থ মেয়েরাই বেশি আসতেন।

আমি আমার পাঠের সময় নিজের তৈরি করা কোনো শব্দ বা নিজের ধারণা মতো কোনো কথা আনতাম না। আমার যেটা তৈরি করা থাকত আগের থেকে অর্থাৎ উনি যেটা তৈরি করে দিতেন দুঘণ্টা-আড়াই ঘণ্টার জন্য সেটাই শুধু পাঠ করতাম। উনি এমনভাবে তৈরি করে দিতেন নিজের কোনো শব্দ বা কথা আনার প্রয়োজনই হতো না।

শ্রোতাদের কাছ থেকে আমার পাঠ সংক্রান্ত কোনোদিনই কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া আসেনি। কোনো সমালোচনাও আসেনি। বা কেউ কোনোদিন বলেনি 'এটা ঠিক হল না, বা ওটা বললে ভাল হয়'। আমি যখন যেটা করেছি ওঁরা তখন সেটা শুনেছেন। মতামতটা জানিয়েছেন কোনটা পাঠ করব এই বিষয়ে অর্থাৎ 'আমাদের এখানে (একটা পাঠের নাম করে বলতেন) আজ এই পাঠটা করবেন' এই পর্যন্ত। অন্যরকম মতামত দেবার সাহসও তাঁরা দেখাতেন না। কারণ সব আসরেই উনি থাকতেন। তবু কারও যদি কোনো প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা বা মতামত থাকত সেটা ওনাকে করতেন এবং উনিও যথাযথ উত্তর দিতেন। আমাকে কেউ কোনোদিন কিছু জিজ্ঞাসা করেনি। সেটা ছোট বয়সে হোক বা বড় বয়সে হোক।

এই কথকতার দিকে এলাম কারণ ছোটবেলা থেকে আমার এ বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ ছিল। আর আমার মা যেহেতু এসব বিষয়ে বরাবরই আগ্রহী ছিলেন যেতে চাইলেই উনি সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন। আমাদের চন্দননগরে সতীশচন্দ্র কথকতা করতেন তাঁকে আমরা সতীশ কথক বলতাম। তাঁর পাঠ ভাল লাগত শুনতে। কিন্তু অত ছোট বয়সে ওই পাঠ নিয়ে কোনো চিন্তা বা ধারণার জন্ম দিত না। তাই আগে বা পরে কোন কথকের গান আমার ভাল লেগেছে তা বলতে পারব না। আর পরবর্তীতেও সেইরকমভাবে কারও পাঠ শুনিনি। একই আসরে আমার পাঠের আগে হয়তো কারও পাঠ আছে—তখন কিছুটা শুনেছি, এইরকমভাবে কিছু কিছু কথকের উপস্থাপনা দেখেছি। তবে তাঁরা আমার মনে খুব রেখাপাত করেননি। আমি অবশ্য

কীর্তন শুনতে খুব ভালবাসতাম—এখনও বাসি। আসরে আমার আগে বা পরে যদি কীর্তনের অনুষ্ঠান থাকত সেটা প্রথম থেকেই মন দিয়ে শুনতাম।

কথকতায়ও কীর্তন গান লাগে। আমি নিজেও কীর্তন করতাম। কীর্তনের মধ্যেও অনেক রকম গান থাকে। এমনি কীর্তন, পালাকীর্তন, ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, চণ্ডী, চৈতন্য-চরিতামৃত সবই কীর্তনের মধ্যে পড়ে। আমার ভাল লাগত এবং আগ্রহ নিয়েই শুনতাম।

আমার রেকর্ড হয়েছে হিন্দুস্তান কোম্পানি থেকে। [দেবী মাহাত্ম্য (শ্রীশ্রীচণ্ডী) H 1922, 78] কিন্তু কবে হয়েছে তারিখটা মনে নেই। মনে হয় বরানগর থাকাকালীন। আমি বরানগরে পাঁচ বছর ছিলাম। বরানগর ঝুলনতলা, পাঠবাড়ি তার পাশে থাকতাম। তখন কলকাতায় খুব অনুষ্ঠান করেছি। আমার একটা বাঁধা ট্যাক্সি ছিল। যিনি ড্রাইভার ছিলেন তাঁর নিজের ট্যাক্সি ওটা। ছেলেটি সারাদিন অন্য ভাড়া খাটত, বিকেল হলে আমার ওখানে চলে আসত। ওটাতে করে আমি কলকাতার নানা আসরে গাইতে যেতাম। পাঠ শেষে ওটা করে বাড়ি ফিরতাম।

অন্য পাঠক বা কথকের সঙ্গে আমার সেইরকম একটা সম্পর্ক ছিল না। আসলে কথক সমাজ বলে কিছু ছিল না। কথক যাঁরা ছিলেন সবারই এক-একটা নিজস্ব ভঙ্গি ছিল। তবে ওনার কাছে অনেকে পাঠ নিয়ে আলোচনা করতে আসতেন। কেউ-কেউ সেইসময় ব্যাখ্যাকার ছিলেন। ব্যাখ্যা শুনতে আমার খুব ভাল লাগত। মহানন্দ ব্রহ্মচারী এইরকম এক ব্যাখ্যাকার ছিলেন। তাঁর ব্যাখ্যা আমার তো খুব ভাল লাগত।

কথকতা আর ব্যাখ্যা কখনও এক নয়। কথকতার মধ্যে আছে গল্প-উপন্যাস, অন্যান্য শাস্ত্রের আলোচনা, উদাহরণ, গান আর পাঠ।

আর ব্যাখ্যার মধ্যে আছে শুধুই ব্যাখ্যা আর সংস্কৃত শ্লোক। সংস্কৃতজ্ঞ সংস্কৃত শ্লোক বলে তার ব্যাখ্যা করতেন। আবার কখনও-কখনও অন্য কোনো বিষয় যুক্ত করে তার থেকে উদাহরণ দিয়ে ব্যাখ্যা করতেন। ব্যাখ্যা একেই বলে। কথকতা আর ব্যাখ্যার মধ্যে কোনো মিল নেই।

কথকতা ঠিক অভিনয় নয়। তবে পাঠ করতে গেলে অভিনয়ের কিছু এসে পড়ে। আসলে পাঠের সময় নানারকম ভাব আনতে হয়। কখনও কাঁদতেও হয়। সেই কান্না শ্রোতাদের মধ্যে ঠিকভাবে গেলে তাঁরাও চোখের জলে ভাসতেন। এটা একেবারেই ভাবের ব্যাপার। এরজন্য অভিনয় করার দরকার হয় না অভিনয়ের মতো শুনতে হলেও।

আমার আগে বা সেই সময় কোনো মহিলা কথক ছিলেন না। আমিই প্রথম এবং তখনকার একমাত্র মহিলা কথক ঠাকুরানি। আমার আগে কথক ঠাকুর ছিলেন অনেকেই। তবে তাঁরা বেশিরভাগই পূর্ববঙ্গের।

কথকতার সময় বলতে কিছু নেই। সারা বছর এই অনুষ্ঠান হতো। অন্তত আমি তো

সারা বছরই পাঠ করতাম এখানে-ওখানে। নিমন্ত্রণ পেতামও খুব। তাই বছরের কোন সময়টা এই পাঠ বেশি হতো বলা কঠিন। তবুও ধর্মীয় অনুষ্ঠান যে মাসগুলোতে বেশি হয় স্বাভাবিকভাবে এই পাঠও বেশি হয় যেমন বৈশাখ, আষাঢ়, কার্তিক, চৈত্র ইত্যাদি। কিন্তু শুধু ধর্মীয় আসরে পাঠ হতো এমনটা নয়, গৃহের কোনো মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান বা শ্রাদ্ধবাসরেও এই পাঠের ব্যবস্থা হতো।

একজন মহিলা কথক এবং একজন পুরুষ কথকের মধ্যে পার্থক্য তো থাকবে। একজন মহিলা কথক সীতা বা কুন্তীকে তার পাঠের মধ্যে দিয়ে যেভাবে হাজির করবেন একজন পুরুষ কথকের পক্ষে তা সম্ভব হবে কি? কুন্তী বা সীতার দুঃখ আমি যেভাবে অনুভব করতে পারি সেই অনুভবের জায়গাটায় পুরুষদের পৌঁছনো সম্ভব নয়। আমি মহিলা বলে সীতা বা কুন্তীর পাঠের সময় তাঁদের সঙ্গে আমি একাত্ম হয়েছি। তাঁদের ব্যথা আমার ব্যথা, আমার দুঃখ, আমার যন্ত্রণা। এই ভাবটা আমার মধ্যে এসে যেত। পুরুষরা দুঃখটা বুঝতেন কিন্তু তাঁদের নিজেদের দুঃখ হিসেবে নয়।

আমি কথক হতে পেরেছিলাম আমার মা আর স্বামীর সাহায্য ও প্রেরণায়। কিন্তু বাইরের সমাজ বিশেষ করে সেইসময় এটাকে এত সহজভাবে মেনে নেবে কি? নেয়ওনি। বাধা এসেছে প্রচুর। আর এই বাধা পণ্ডিতমণ্ডলির ভেতর থেকেই বেশি এসেছে। তাঁরা শাস্ত্র তুলে হৈ-চৈ ফেলে দিতেন। তাঁরা বলতেন মহিলাদের শাস্ত্রপাঠে কোনো অধিকার নেই, ভাগবতে অধিকার নেই এ সমস্ত শাস্ত্রবিরোধী কাজ হচ্ছে। এইসব কথা তাঁরা ওনাকেই বলতেন। উনি ওঁদের এসব কথার উত্তর শাস্ত্র দিয়েই দিতেন। উনি মনুসংহিতা খুলে দেখাতেন পুরাকালে মহিলাদের পৈতা হতো, তাঁরা গুরুগৃহে বাস করতেন, তাঁরা বেদ পড়তেও পারতেন পড়াতেও পারতেন। পুরাকালে যদি পারে তাহলে এখন মেয়েদের ভাগবতে অধিকার থাকবে না কেন? আবার ব্যাসদেবের রচনা থেকেও দেখাতেন। 'স্ত্রী শূদ্র, দ্বিজ বন্ধুণাং ত্রয়ী ন সুখী গোচরা।' ত্রয়ী সুখী ন গোচরা বলতে স্ত্রী শূদ্র আর দ্বিজ বন্ধু যারা ব্রাহ্মণ হয়েও ব্রাহ্মণের কাজ করে না তাঁদের ত্রয়ী অর্থাৎ বেদ বা ওঙ্কার-এ অধিকার নেই। এঁরা ওম উচ্চারণ করতে পারবেন না। উনি পুরাকালের গার্গী, মৈত্রেয়ীর উদাহরণ দিয়েও দেখিয়েছেন। অনেক বড়-বড় জ্ঞানী পণ্ডিতের সঙ্গে ওঁর তর্ক-বিতর্ক হয়েছে।

সব শেষে আমি এটা বলব—ওনার কৃতিত্ব অনেক। অপরিসীম জ্ঞান ছিল ওঁর। এখন চুরানব্বই বছর বয়স ওনার কিন্তু এখনও কত স্মরণশক্তি। চোখের দৃষ্টির স্বচ্ছতা কমে যাওয়ার জন্য অথর্ব হয়ে পড়েছেন কিন্তু জ্ঞান এখনও অগাধ। এই বৃদ্ধ বয়সে আমি কবে কোন অনুষ্ঠানে কোন সংস্কৃত শ্লোক পাঠ করেছিলাম উনি এখনও মুখস্থ বলে যান। লেখাপড়া (স্কুল কলেজের) কতদূর কী করেছেন জানি না, কিন্তু পুরাণ, শাস্ত্র, ভাগবতে জ্ঞান ছিল অপরিসীম। একটা মানুষের মধ্যে এমন অনেক কিছু ছিল ভাবলে অবাক হতে হয়।

ওনার রক্তে ছিল কথকতা। কথক ঠাকুরের বংশ বললেই ঠিক বলা হয়। আমার

শ্বশুর মহাশয় রামায়ণ গান করতেন। আমার মেজভাসুর গান গাইতেন। কথক অবশ্য উনিই প্রথম। উনি যাঁকে গুরু মেনেছিলেন তিনি ছিলেন এক কথক। তাঁর কাছ থেকেই উনি কথকতা শিখেছিলেন এবং তাঁর প্রভাবে কথক হয়েছিলেন। গুরুর নাম রাধাবিনোদ গোস্বামী। তাঁর কাছে ওনার এই শিক্ষা। □

রামায়ণ সম্রাট মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তীর কথা

লিখেছেন : লছমন প্রসাদ চক্রবর্তী

বাঁকুড়া জেলার সোনামুখির অন্তর্গত বৈকুণ্ঠপুর পল্লীতে রামায়ণ সম্রাট মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তীর জন্ম। ১৩১২ (১৯০৫) সালের ২৪শে শ্রাবণ।

জ্যাঠামশাই মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তীর মুখে শুনেছি আমরা কৃত্তিবাস বংশীয়। মহাকবি কৃত্তিবাস ওঝার এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা নরসিংহ ওঝার বংশধর আমরা। আদি নিবাস নদীয়ার ফুলিয়াতে। যাজক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পিতা রামকিঙ্কর চক্রবর্তীর নিকট নিতান্ত শৈশবে সংস্কৃতের পাঠ নেন মৃত্যুঞ্জয়। পাঠ নিয়েছেন ঠাকুর্দা মাধবচন্দ্র ন্যায়রত্নের কাছেও। পরে চন্দননগরস্থিত কালীদাস চতুষ্পাঠীতে কিছুদিন সংস্কৃত শেখেন।

আঠারো বছর বয়সেই সোনামুখিতে তিনি এক যাত্রাদল গড়লেন। লক্ষ্মণ, বাল্মীকি ও শকুনির চরিত্রে অভিনয় করতেন মৃত্যুঞ্জয়। সেই সময় তিনি বহুস্থানে যাত্রাগান করেন। তবে দলটি কয়েক বৎসরের মধ্যেই ভেঙে যায়। এই সময় তাঁর কাকা প্রভাকর চক্রবর্তী (পুরাণ রত্ন) মহাশয় একখানি রামায়ণ পুঁথি (প্রভাকরের হাতে লেখা) তাঁকে দিয়ে বললেন, 'এই রামায়ণ পুঁথিখানি পড় এবং রামায়ণ গান কর'।

কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় তো জানেন না কী করে রামায়ণ গান করতে হয়। তাহা শিখিবার জন্য গুরুর দরকার। কাজেই তিনি গেলেন স্থানীয় রামায়ণ গায়ক শ্রীযুক্ত ফকিরচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে।

বড় বড় ওস্তাদের কাছে গেলেন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিখতে এবং স্বল্পকালের মধ্যেই গান শিখে নিজেই গান রচনা করতে লাগলেন। ভালভাবে আয়ত্ত করলেন যাত্রাপালার গানও। এরপর মধ্যম ভ্রাতা বৈদ্যনাথকে শিখিয়ে পড়িয়ে নিয়ে শুরু করলেন রামায়ণ গান। কণ্ঠস্বর দুভায়েরই লালিত্যমণ্ডিত। রামায়ণ গান সূত্রে ভারতের হেন স্থান নেই যেখানে তাঁরা যাননি। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু তাঁকে বহুবার দিল্লীতে আমন্ত্রণ করেছেন। গান করেছেন পশ্চিমবঙ্গের রাজভবনেও। বিদেশে রামায়ণ গানের জন্যও ডাক পেয়েছেন। কিন্তু যাননি। তিনি বলতেন : ভারতের ঐতিহ্য রামায়ণ গান বিদেশকে দেব না।

সহস্র লোকের মন জয় করেছেন তাঁরা। দুভাই ছিলেন এক প্রাণ। ধন্য হয়েছেন মা আনন্দময়ীর কৃপা ও সান্নিধ্যে। মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তীর রামায়ণ গান সম্পর্কে

এই অংশে ব্যবহৃত ছবিটি মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তীর—সম্পাদক।

বিশদ আলোচনার আগে আর একটি তথ্য পেশ করি : রামায়ণ গানকে কুলবৃত্তি হিসাবে, এই শিল্পকে বংশ পরম্পরায় ধরে রাখতে চেয়েছিলেন তিনি। যেজন্য রেকর্ড কোম্পানির শত অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি কখনও রেকর্ড করাতে রাজি হননি। আমাকে দিনের পর দিন তালিম দিয়েছেন। এবং অবশেষে এক আসরে আমাকে হাজির করে ঘোষণা করেন : 'এই আমার রেকর্ড।'

আবার আকাশবাণীর আমন্ত্রণ উপেক্ষা করেছেন রামায়ণ গানকে খর্বিত করতে চাননি বলে। তিনি বিশ্বাস করতেন না পনেরো মিনিট বা আধঘণ্টায় রামায়ণ গান সম্ভব। আকাশবাণী কর্তৃপক্ষকে তিনি স্পষ্ট বলে দিয়েছিলেন, 'একঘণ্টার কমে পারব না'। কর্তৃপক্ষ আধঘণ্টার বেশি সময় দিতে পারবেন না বলায় তাঁদের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন।

মৃত্যুঞ্জয়বাবুর রামায়ণ গান অতি সুমধুর, তিনি গানে বসিতেন অতি শুদ্ধাচারে। প্রথমেই বিগ্রহটিকে বুকে লাগাইয়া শঙ্খধ্বনি সহযোগে আসরে আসিয়া বসিতেন। তৎপরে পূজাপাঠ ও মঙ্গলাচরণ, তৎপরে শ্রীশ্রী রামায়ণ গান আরম্ভ। তাঁর আসরে ভাল মাইক এবং জোরালো লাইট দরকার হত। তিনি ছিলেন একাধারে গায়ক, অভিনেতা, কবি ও পাণ্ডিত। তিনি গানগুলি গাইতেন অতি সুমধুর সুরে। অভিনয় করিতেন অতিশয় ভাবাবেগে। কবিত্ব ফলাইতেন স্বকীয় মর্যাদায়। পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিতেন অভিনব ব্যাখ্যায়।

এই গান, অভিনয়, কবিত্ব ও পাণ্ডিত্য সহযোগেই গড়ে উঠেছিল তাঁর রামায়ণ গান। তিনি ছিলেন পয়ারসিদ্ধ। অর্থাৎ পয়ারকে নানারূপ রাগ-রাগিনী দ্বারা সজ্জিত করতেন। যখন যে ভাবের প্রয়োজন তখনই দেখা যেত সেই সুরে বেরিয়ে আসছে তাঁর কণ্ঠ থেকে। এছাড়া নানা ভাবের গান সবই রাগাশ্রিত। ভারতবর্ষে যত রকমের রামায়ণ কাব্য বের হয়েছে সবকটি থেকেই তিনি গ্রহণ করেছেন। সংস্কৃত, বাংলা ও হিন্দি এই তিন ভাষাই প্রয়োগ করিতেন তাঁর রামায়ণ গানে। এবং সংস্কৃত, বাংলা ও হিন্দিতে যত রকমের রামায়ণ লেখা হয়েছে সে সবই ছিল তাঁর দখলে। মহাকবি বাল্মীকির সংস্কৃত রামায়ণ। তুলসীদাসজীর হিন্দি ও কৃত্তিবাসজীর বাংলা এগুলি ছিল আসল, তাঁর কাছে মূল খুঁটি। এ ছাড়া তিনি ভিন্টিকাব্য, কালিদাসের রঘুবংশ এবং ভাসপ্রণীত প্রতিমা নাটক থেকেও বহু চোখা-চোখা জিনিস তাঁর রামায়ণ গানে দিয়েছেন।

অধ্যাত্ম রামায়ণ, অদ্ভুত রামায়ণ, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ ও কালিসিংহের রামায়ণ থেকেও বহু বিষয় নিয়েছিলেন। এছাড়া তিনি বহু নাটক, যাত্রাগান, তৎকালীন সময়ে যাহা প্রকাশ পাইয়াছিল সমস্তই গ্রহণ করেছেন।

মহাত্মা গিরিশ ঘোষের লেখা গানও তিনি দিয়েছেন তাঁর রামায়ণ গানে, যেমন :

চল সবে ভার নিয়ে যাই অজধ্যায় রাম রাজা হবে।
দিব তাঁর চরণে ভার সে বিনে ভার কে আর লবে।।...

ডি. এল. রায়ের লেখা গানও দিয়েছেন। এবং সব থেকে আকর্ষণ ছিল তৎকালীন যাত্রাপালার গানগুলি। গানগুলি তিনি অতি সুমধুর সুরে গাইতেন। তাঁর নিজের লেখা গান, অভিনয় তো অশেষ। সব কিছুর সমন্বয় সাধন করেছিলেন। তাঁর ছিল একটাই জিনিস, সেটা হল কখন কীভাবে পরিবেশন করলে দর্শক বা শ্রোতাদের মন জয় করা যাবে তা তিনি জানতেন। সেইভাবেই তিনি পরিবেশন করতেন।

রামায়ণ গানের মধ্যে বিবেকানন্দ ও অন্যান্য মনীষীদের বাণীও প্রয়োগ করতেন।

নীলকণ্ঠের সুর অর্থাৎ সাধক কবি নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সুর ও তাঁর গানও তিনি ব্যবহার করেছেন। সংস্কৃত শ্লোকগুলি বলে তারপর বাংলায় ব্যাখ্যা করতেন। হিন্দি দোহা চোপাই বলে সেগুলিরও তর্জমা করতেন বাংলাতে। মাইকেল মধুসূদন দত্তের কাব্য থেকেও বহু জিনিস নিয়েছেন। গান বাঁধতেন আসরে বসেই। পরে সেগুলি আবার লিখে রাখতেন আসর শেষে। তাঁর অভিনয় দক্ষতা ছিল অসাধারণ। এই দেখছি তিনি কেঁদে ভাসিয়ে দিলেন আবার মুহূর্তের মধ্যে দেখছি হো হো করে হাসছেন।

একদিকে সীতামা হয়ে কাঁদছেন, অন্যদিকে রাবণ হয়ে অট্টহাস্য করছেন। এমন মনে হত যেন তাঁর মুখ-সুখ খানাই পাল্টে গেল, মুখটা যেন দুটো ভাগ হয়ে গেল, একদিকে চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়ছে আর দিকে চোখে জল নেই, সেই দিকের চোখ ও মুখ হাসছে।

এ কী করে সম্ভব জিজ্ঞেস করলে বলতেন 'এ জিনিস হল ভাব রাজ্যের জিনিস। এ জিনিস বলে বোঝানো যায় না।'

রামায়ণ গানে বিভিন্ন মত আছে। ভিন্ন ভিন্ন মত অনুযায়ী আছে : দুই তিন রকম রামায়ণ।

শ্রোতাদের বলতেনও সেকথা, রামায়ণের একটা মত নয় নেই বিভিন্ন মত আছে। কোনটা ঠিক আর কোনটা ঠিক নয় সেটা কারও পক্ষে বলা সম্ভব নয়। এই বলে বলতেন গোস্বামী তুলসীদাসজী সেই জন্যই বলেছেন রামায়ণ বহুকোটি অপারা! অর্থাৎ রামায়ণ মহাকাব্যে বহু কোটি কোটি মত আছে। যেমন দেখুন কৃত্তিবাসজী বলেছেন রামচন্দ্র যে অকাল বোধন করেছিলেন তার পুরোহিত রামচন্দ্র নিজে। আবার কালিসিংহ বলেছেন অকাল বোধনে পুরোহিত মহারাজ রাবণ। এবার কোনটা ঠিক কী করে বিচার করা যায় বলুন। তবে এই প্রসঙ্গে তিনি বলতেন যে দুটি মত রয়েছে, কোনটা ঠিক কোনটা ঠিক নয় বলা শক্ত কিন্তু যেহেতু আমি কৃত্তিবাস বংশীয় সেই কারণে আমি কৃত্তিবাসজীর মতটিই গ্রহণ করে গাইছি। এবং সেই সময়েই বললেন এ কথাটি 'রামায়ণ বহুকোটি অপারা, রামায়ণে বহু কোটি মত আছে।' গানের মধ্যে তিনি হাস্যরস এবং রসিকতাও পরিবেশন করতেন।

মানুষের মন জয় করতে পেরেছিলেন মৃত্যুঞ্জয়। মানুষের অন্তরের অন্তস্থলে পৌঁছে দিতেন তাঁদের মনের খোরাককে। তাঁদের সামনে সম্পূর্ণ ছবিটি ভেসে উঠত। তাঁর

বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল শবরীর প্রতিক্ষা পালাটিতে। এটি তিনি নিজস্ব সত্ত্বা দিয়ে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে এবং পুরাণ কাঠামোর আশ্রয়ে সৃষ্টি করেছিলেন।
অষ্টাদশ পুরাণ কণ্ঠস্থ ছিল মৃত্যুঞ্জয়ের।
অভীচার যজ্ঞ পালায় রাবণকে বড় করে দেখিয়েছেন। সেখানে রাবণের মরণ যজ্ঞ করছেন রামচন্দ্র; রাবণ সেই যজ্ঞে পুরোহিত। কাজেই দেখুন রাবণ সেখানে নিজের মরণ যজ্ঞে নিজেই পুরোহিত হয়ে নিজেরই আত্মাহুতি নিজে দিচ্ছেন॥
জয় রাম বলে তিনি যখন হুঙ্কার ছাড়তেন, তখন মনে হত সত্যই যেন স্বয়ং মহাবীর হুঙ্কার ছাড়লেন। আর গোটা আসর কেঁপে উঠত সেই হুঙ্কারে।
শবরীর পালাতে তিনি একটি বিশেষ জিনিস প্রমাণ করেছেন তা হল; ভক্তি বিনা পরমেশ্বরকে পাওয়া যায় না। তাই তুলসীদাসের রামচরিত মানস থেকে এই উক্তিটি তিনি দিতেন:

চৌপাই

জাতি পাঁতি কুল ধর্ম বড়াঈ।
ধন বল পরিজন গুণ চতুরাঈ॥
ভকতি হীন নর সোহই কৈসা।
বিনু জল বারিদ দেখিয় জৈসা॥

অর্থাৎ, জাতি শ্রেণীকুল ও ধর্মের খ্যাতি, ধনবল পরিজন, গুণ ও চতুরতা এ সকল থাকিলেও ভক্তি যাহার নাই, সে তেমনই শোভা পায়, যেমন জল বিনা মেঘ দেখিতে পাওয়া যায়। এক কথায় বিনা জলের মেঘের মত। গানের মধ্যে তিনি বলেছেন:

আখর

(বিনাজলের মেঘ যেন, যে নর ভকতিহীন)

ভক্ত সংবাদ পালাতে ভরতের ভ্রাতৃভক্তি যে কত বড় তা তিনি অতি নিপুণ ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। যখন ভরতকে চিত্রকূট পর্বতে রামচন্দ্র বলছেন 'ভরত, পিতা তোমাকেই চৌদ্দ বৎসরের জন্য রাজত্ব দিয়ে গেছেন, তুমি সেই রাজত্ব গ্রহণ কর।' তার উত্তরে ভরতের উক্তিটি কি সুমধুর প্রাণস্পর্শী তা মহাকবি বাল্মীকির শ্লোকের দ্বারা তিনি ব্যক্ত করেছেন:

শ্লোক

বৃদ্ধৌরসাং রাজধুরাং প্রবোঢ়ুং
কথং কনীয়ান হমুং সহেয়।
মা মাং প্রযুঙ্ক্থাঃ কুল কীর্ত্তি—
লোপে প্রাহস্ম রামং ভরতোঽপি ধম্যম্॥

অর্থ

তখন শ্রীভরত শ্রীরামকে এই বক্ষ্যমান ধর্ম্মানুগত বাক্যগুলি বললেন: হে রঘুবংশাবতংশ। জ্যৈষ্ঠাহ রাজ্য (অর্থাৎ এই রঘুবংশের আদি হতে জ্যৈষ্ঠানুক্রমে রাজা হয়ে আসছেন)

আমি কনিষ্ঠ হয়ে কী প্রকারে সেই রাজত্ব গ্রহণ করি? রঘু বংশের কীর্ত্তিলোপকর কার্যে আমাকে নিযুক্ত করবেন না ॥

এই ভাবে প্রতি পালাতে তিনি গান শ্লোক হিন্দি দোঁহা চৌপাই, অভিনয়, দেহতত্ত্ব প্রভৃতি নানারূপ সম্ভার দিয়ে মানুষের হৃদয়কে ভাবিয়ে দিয়েছেন। তাঁর প্রতিটি পালা যেন শ্রীরামের প্রতিচ্ছবি। প্রতিটি পালা এক একটি বিশেষ ভাবাবেগ সৃষ্টি করেছে। তিনি মোট ৩৭টি পালা তৈরি করেছেন এতেই তিনি সম্পূর্ণ রামায়ণ গান প্রকাশ করেছেন। তিনি অভিনয়গুলিকে নিজস্ব স্বকীয়তায় প্রভাবিত করেছেন বলেই সমাজ জীবনে এত সমৃদ্ধি লাভ করেছেন তিনি। তিনি একা হারমোনিয়াম বাজিয়ে বসে গাইতেন কিন্তু মনে হত তিনি একের মধ্যে বহু। তখনি সীতা, তখনি রাম, তখনি রাবণ তখনি বিভীষণ তখনি লক্ষ্মণ তখন বাল্মীকি সকলে অবাক হতেন। এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়ে গেল সেটি হল একবার কোকলা বাড়ী অথবা বেহালায় রায় বাড়িতে বাবার রামায়ণ গান হচ্ছে। আসরে ছিলেন চিত্র পরিচালক গুরু দত্ত মহাশয়, চিত্রতারকা বিকাশ রায়, উত্তমকুমার প্রমুখ বহু বিশিষ্ট শিল্পী। সেখানে গানের শেষে বাবার বিশ্রামকক্ষে গিয়ে গুরু দত্ত মহাশয় বিকাশ রায় মহাশয়কে বললেন "বিকাশ পার এরকম একাই রাম একাই সীতা একাই সব" তার উত্তরে বিকাশ বাবু বললেন "মাপ করবেন তা পারব না। একটা করে চরিত্র বলুন আমরা করে দেব, কিন্তু একাই এক সঙ্গে এত সব ও আমরা পারব না। ও একমাত্র মৃত্যুঞ্জয় বাবুই পারেন।" এভাবে বহু গায়ক বহু শিল্পীর প্রশংসা তিনি পেয়েছেন। তাঁর রচিত গানের সুরও তাঁর নিজেরই দেওয়া। কীর্ত্তন গানও বহু লিখেছেন। অকাল-বোধন পালা থেকে তাঁর লেখা গানের একটি নমুনা পেশ করি :

দুর্গা / তেওরা

দেবীর বোধন করে নবঘন সাগর তীরে সন্ধ্যাকালে।
গড়িয়া মুরতি মাতা দশ ভুজা পূজিছে পুষ্প বিল্বদলে
কপিগণ আনে ফল ফুল, করে আয়োজন যতেক বীরে,
বিভীষণ দেয় ধূপের শিখা ; সুগ্রীবাদী কর জোড় করে,
কুসুম চন্দন লইয়ে লক্ষ্মণ, রামে তুলে দেন করিয়া যতন
সঁপিয়া ঘটেতে ভকতি ভরে রাম ভেসে যান নয়ন জলে ॥ □

বাসন্তী চৌধুরীর কথা

কবেকার কথা, তাতো মনে নেই। বালিকা বয়সে খুব কথা বলতাম। কথার বাঁধুনি ও ভঙ্গীও নাকি বেশ চিত্তাকর্ষক ছিল। আমার মা বলতেন, "এ মেয়ে বড় হয়ে কথা বেচে খাবে।" মাতৃবাক্য লঙ্ঘিত হয়নি। উত্তরজীবনে আমাকে কথা বেচেই খেতে হয়েছে—অধ্যাপনা ও কথকতা। কলেজ জীবনে অধ্যাপনা করার সঙ্গে সঙ্গে ১৯৫৪ সাল থেকে সভাসমিতিতে বক্তৃতা দিতে মাঝে মাঝে ডাক পড়তো,—বেশীর ভাগ সেগুলি ধর্মসভা। বেদান্তের ওপর ভিত্তি করে তখন বক্তৃতা দিতাম, কেননা আমার এম. এ-তে সংস্কৃতের বিশেষ নির্বাচিত বিষয়ই ছিল বেদান্ত। ১৯৪৯ সালে কোন্নগর এসে পরিচয় হয়েছিল এক পরম বৈষ্ণব কোন্নগর হাইস্কুলের অবসর-প্রাপ্ত শিক্ষক যতীন্দ্রনাথ রায়ের সঙ্গে। তিনি ভাগবতের প্রখ্যাত বক্তা প্রভুপাদ রাধাবিনোদ গোস্বামীর শিষ্য ছিলেন এবং নিজেও ভাগবত ব্যাখ্যাকার হিসাবে সুপরিচিত ছিলেন। খেয়ানৌকায় গঙ্গা পার হয়ে কোন্নগরের ওপারে পানিহাটীতে "রাঘব পাণ্ডিতের বাড়ী" নিত্য ভাগবতপাঠ করতে যেতেন। তিনি আমাকে শুধু মা বলে ডাকতেনই না—গর্ভধারিণী মায়ের মতো দেখতেন বলে ঐ আশী বছরের বৃদ্ধের ভূমিষ্ঠ প্রণামও আমাকে গ্রহণ করতে হোতো। তিনি সভাসমিতিতে আমার বক্তৃতা শুনে শুনে একদিন আমাকে বললেন, "মা, আমি অক্ষম হয়ে পড়ছি। রোজ ওপারে ভাগবতপাঠ করতে যেতে আমার কষ্টই হয়। এক বৈষ্ণবপাঠক তাঁর ভাগবতপাঠের দায়িত্ব আমাকে দিয়ে বৃন্দাবনে চলে গিয়েছিলেন। আমার ভাবনা হয়, আমি কাকে এই দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে পরপারে যেতে পারবো। আমার মনে বিশ্বাস হয়েছে, যে আমি পথ খুঁজে পেয়েছি। তুমিই মা আমার এই কাজটার ধারাবহন করতে পারবে।" আমি বলি, "আমি তো বেদান্তচর্চা করেছি, ভাগবতগ্রন্থ তো পড়িইনি। কেমন করে এ গ্রন্থ পাঠ ব্যাখ্যা করবো?" তিনি বলেন, "না মা তোমার প্রতি গুরুকৃপা আছে। তোমার সাতবছর বয়সে শ্রীশ্রীরামঠাকুর তোমাকে দীক্ষা দিয়েছেন। আর তুমি বেদান্ত পড়েছো বলেই তো ভাগবতপাঠও করতে বলছি। বেদান্তের ভিত্তিভূমি থাকলে ভক্তি-শাস্ত্রপাঠ আরো উজ্জ্বল হবে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবও তো বলেছেন—বেদান্ত-জ্ঞান আঁচলে বেঁধে ভক্তির রাস্তায় নামতে হবে। তাছাড়া, তুমি তো গান গাইতে পারো। ঐ পাঠের সঙ্গে সঙ্গে তুমি গান মিশিয়ে করে দেখো, তাতে বহুলোকের মনোরঞ্জন করতে পারবে।" ভাগবত পাঠকরা গান করবেন না, শুধু শাস্ত্রপাঠ ও ব্যাখ্যা করবেন এইরকম সংস্কার অনেকের মধ্যে আছে। যতীন

রায়ের কথাটা মনে ধরলো। ভাবলাম, শ্রীমদ্‌ভাগবতকে যদি কথকতার মাধ্যমে পরিবেশন করি, তাহলে তাতে গান করলে কারো কিছু বলারও থাকবে না। প্রথম পাঠ ১৯৫৯ সালে করলাম কোন্নগর হরিসভায়। একশো বছরেরও পুরোনো হরিসভা। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব দক্ষিণেশ্বর থেকে নৌকো পার হয়ে এসে এই হরিসভায় বসতেন। বহু বৈষ্ণবের স্পর্শপূত এই ব্যাসাসন। সামনে সুসজ্জিত শ্রীরাধাগোবিন্দ বিগ্রহ। বৈষ্ণব ও ভক্তসমাবেশে সেদিন প্রথম ভাগবতপাঠ করলাম। একটি শ্লোক সংগীত-সহযোগে ব্যাখ্যা করতে লাগলো দু ঘণ্টা। উল্লসিত হয়ে উঠলেন বৃদ্ধ যতীন রায়। "মা তুমি পারবে, বলেছিলাম না? তুমি এ গ্রন্থপাঠ ছেড়ো না।" নিজে দিয়ে গেলেন আমাকে ভাগবতের একটি খণ্ড—দশম স্কন্ধ। আমিও উৎসাহী হয়ে আলমারী থেকে খুঁজে পেতে বের করলাম শ্রীধর স্বামীর টীকাসহ আর একটি সম্পূর্ণ ভাগবতগ্রন্থ। এই ব্যাপারের ৬।৭ বছর আগে একবার দিল্লী গিয়েছিলাম। দিল্লীতে আমার ন' মামা তখন এক বছর হোলো মারা গেছেন। তিনি গণিতজ্ঞ হলেও বৌদ্ধদর্শন বেদান্ত ও বৈষ্ণব-শাস্ত্রেও সুপণ্ডিত ছিলেন। সব বিষয়ে তাঁর প্রচুর গ্রন্থ ছিল। মামীমা তাঁর সংস্কৃত গ্রন্থ সংগ্রহ আমাকে যোগ্য উত্তরাধিকারী বিবেচনা করে দিয়ে দিলেন। তার মধ্যে দুখণ্ডে সম্পূর্ণ ভাগবতও ছিল। গ্রন্থ কৃপা করে কয়েকবছর আগেই আমার কাছে অযাচিতভাবে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। আর যথা সময়ের জন্য প্রতীক্ষা করেছিলেন। ঝেড়েঝুড়ে এই বার তাঁকে আমার বরণ করে নেবার পালা। হরিসভায় পাঠের প্রশস্তি শুনে প্রতিবেশী রাম মুখার্জী দ্বিতীয় পাঠের জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। অবসরপ্রাপ্ত একদা শিক্ষক আমার বৃদ্ধ শ্বশুরমশাই আমাদের বাড়ীর ছাদে বসেই মাইকে শুনছিলেন। তিনি বললেন, "আমি দূর থেকে তো সব কথা বুঝতে পারছিলাম না, তবে বৌমার বাচনভঙ্গী শুনে বুঝলাম ও ভবিষ্যতে নিশ্চয় এতে প্রতিষ্ঠালাভ করতে পারবে।" তার কিছুদিন পরেই আমি নবদ্বীপ গেলাম। মহাপ্রভুর বাড়ী আমার তৃতীয় পাঠ। তখন আমি নবদ্বীপ নিয়মিত প্রতি মাসে যাই বিখ্যাত কীর্ত্তনীয়া রাধাচরণ দাস বাবাজীর কাছে কীর্ত্তন শিখতে। তার আগে রবীন্দ্রসংগীতে গীতভারতী উপাধি পেয়েছি। রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে বিষ্ণুপুরী ঘরাণার ধ্রুপদ তালিম নিয়েছি। প্রসিদ্ধ খেয়াল গায়ক সত্যেন ঘোষালের সুযোগ্য ছাত্র উপেন ঘোষের কাছে ১৫ বছর খেয়াল শিখেছি। কিন্তু মন মজে গিয়েছিল কীর্ত্তনে। বাউলও ভাল লাগতো, তাই সুরেন চক্রবর্ত্তীর কাছেও ১৫ বছর বাউল ও লোকসংগীত শিখতাম। পোড়ামা তলার পূর্ণ বাগচী ও কবি বিমানবিহারী মজুমদার এঁরা আমার কীর্ত্তন শুনতে ভালবাসতেন। সেইজন্য এঁরাই মহাপ্রভুর বাড়ী আমার পাঠের ব্যবস্থা করলেন। আমি ভাগবত কথকতা করে শোনালাম মুখ্যভাবে, কীর্ত্তনও গাইলাম সঙ্গে সঙ্গে। সেখানে বহু বৈষ্ণবশ্রোতা সেদিন উপস্থিত ছিলেন। পাঠের পরদিন আমার কীর্ত্তনের গুরু রাধাচরণ দাস বাবাজীকে জিজ্ঞাসা করলাম, "বাবাজী, শ্রোতারা শুনে কি মন্তব্য করলেন?" তখন বয়স অল্প, খ্যাতি শুনলে আনন্দ হয়, নিন্দা শুনলে দুঃখ পাই। বাবাজী

বললেন, "এঁদের সবার ভাগবত শুনে শুনে কান তৈরী হয়ে আছে। সবাই একবাক্যে বলেছেন এ মেয়েটি ভবিষ্যতে উত্তম ভাগবতবক্তা বা পাঠক হবে। তবে একজন বলেছেন—বৈরাগ্যের কথা বলছে হাতের সোনার চুড়ি বালা বাজিয়ে? তখন সধবা ছিলাম আর সোনার গহনা পরার রেওয়াজও ছিল। আর আমি কথা বলতে গিয়ে হাত তো নেড়েইছি। কিন্তু যেই এইকথা শুনলাম—মনে হোলো

"নিন্দক্ মেরি মিত্ হ্যায়, নিত্ নিত্ ময়লা ধোয়্।
ঐসা নিন্দক্ মর্ গয়ে যব্ ; তুলসীদাস বৈঠ্ রোয়।"

ইনিই আমার প্রকৃত মিত্র বটে। কেননা তিনি বুঝিয়ে দিলেন—একজন কথকের বেশভূষার একটা ইমেজ থাকা দরকার। এতো যে কোনো সভাসমিতি নয়। সেইদিনই সোনার চুড়ি হার বালা খুলে ফেললাম। আর কোনোদিন পাঠের আসরে গলায় তুলসীর মালা, হাতে তুলসীর বালা ও শাঁখা ছাড়া পরিনি। হার্টের গোলমাল হয়েছিল বলে ৺শিবানন্দ গিরি মহারাজ রুদ্রাক্ষের মালা ধারণ করতে বলেছিলেন তাই রুদ্রাক্ষের মালাও পরি। আস্তে আস্তে সাদা কাপড় ছেড়ে গেরুয়া পরেছি। যথাবিহিত সন্ন্যাস না নিয়ে গেরুয়া পরেছেন কেন—জিজ্ঞাসা করেছেন অনেকে। আমার ভাল লাগে তাই পরি। আমার স্বামীরও এই রং ভাল লাগতো বলে পরতে বলতেন। যাঁর আগ্রহ ও পৃষ্ঠপোষকতা না থাকলে আজ আমার কাছে এই জগৎটার দরজা অবরুদ্ধই থাকতো। আমাকে সঙ্গে করে বিভিন্ন আসরে নিয়ে যেতেন। চোখের জলে মুখ চোখ রাঙ্গা ও ভারী হয়ে যেতো। আমি বলতাম, "তুমি তো পরম ভক্ত দেখতে পাই। সায়েন্টিস্ট হয়েও ভগবানের লীলা শুনে তোমার চোখে জল আসে এত! উনি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির পিওর ম্যাথমেটিক্সের প্রফেসর ছিলেন। হেসে বলতেন—"না, না, আমি ভক্ত টক্ত নই। তুমি যে সেন্টিমেন্টে সুড়সুড়ি দিয়ে কথা বলো, তাতেই সবার মতো আমারও চোখে জল আসে।" কথকতায় এ কথাটা মূল্যবান বটে। যুক্তিতর্কের মাধ্যমে তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করা এক, আর রসে-বশে শ্রোতাদের হৃদয়ে প্রবেশ করা অর্থাৎ সেন্টিমেন্টে অ্যাপিল করা যাকে বলে, সেটা আর এক। মস্তিষ্ক ও হৃদয় এই দুটোরই প্রয়োজন আছে কথকতায়। তত্ত্ব ও তথ্য। শুধু তথ্য পরিবেশনে কাহিনীর চিত্রটি কথকের বলার মাধুর্য্যে ও চাতুর্য্যে ফুটে ওঠে। ধীরে ধীরে শ্রোতার চিত্ত সংবেদনশীল হয়ে ওঠে। শ্রোতাদের মধ্যে কিন্তু এমনও কেউ কেউ থাকেন, তাঁরা কাহিনীর অন্তরালে তত্ত্বটুকু আস্বাদন করতে চান। কথকতা প্রসঙ্গে এটা ভুললে চলবে না কোনমতেই। কথক দু-তরফেরই কথা মনে রেখে কথা পরিবেশন করবেন। তত্ত্ব বাহন, তথ্য বাহ্য। তত্ত্বের ভূমিতে রসসমৃদ্ধ তথ্য বসে থাকে। ঘোড়া ছেড়ে যেমন ঘোড়সওয়ারকে কল্পনা করা যায় না, সেইরকম আর কি। ঘোড়াটা গৌণ হলেও লোকের দৃষ্টি পড়ে ঘোড়-সওয়ারের দিকে, তেমনি কথকতায় রসবস্তুকাহিনী মুখ্য হয়ে থাকে কিন্তু তত্ত্বকে বাদ দিয়ে নয়। রসগোল্লা সন্দেশ কিনতে গেলো দোকানদার যেমন ভাঁড়ে করে বা ঠোঙ্গায় মুড়ে দেয়, কিন্তু যে ঐ মিষ্টদ্রব্য আস্বাদন করবে, সে ঠোঙ্গা বা ভাঁড়টা ফেলে দিয়ে

সন্দেশ রসগোল্লাটাই খায়। তবু দোকানদারের কর্ত্তব্য ঠোঙ্গায় মুড়ে বা ভাঁড়ে দেওয়া। তেমনি কথক তো দোকানদারের আসনে বসেছেন, কাজেই তত্ত্বের ঠোঙ্গায় মুড়ে রসযুক্ত তথ্যবস্তু পরিবেশন করবেন। আস্বাদন যথাযোগ্য ভোক্তা হিসেবে হবে। তবে রসগোল্লা খাবার পরও রসগোল্লার ভাঁড়টাও তো চেটে খায় অনেকে—মনে রাখতে হবে।

সংগীত এমনই জিনিষ যা সর্বজনচিত্তাকর্ষী। কাজেই কথকতায় বাচিক ভঙ্গীর সঙ্গে সংগীত উপযুক্ত ভাব বহনে সাহায্য করে। অভিনয়ে যেমন আংগিক, বাচিক, আহার্য সাত্ত্বিক এই চারটি অংগ তেমনি কথকতার অভিনয়ের সঙ্গে কিয়দংশ সাদৃশ্য আছে। আহার্য সম্বন্ধে বলা যায় ডেকরেশন বা মেকআপ অভিনেতার মতো এতে থাকতে পারে না। অভিনয়ে একজন একজনের ভূমিকা গ্রহণ করে বলে তার বেশও গ্রহণ করতে হয় কিন্তু কথকতায় তো একজনই সকলের হয়ে কথা বলবেন। কাজেই আহার্য বা মেকআপের দরকার হয় না। তবে এর আগেই বলা হয়েছে কথকের সাজের মধ্যেই একটা সভ্রাইটি বা সম্ভ্রম আকর্ষণকারী ভাব থাকবে। মাল্যতিলকবস্ত্র উত্তরীয় প্রভৃতিতে শ্রদ্ধা আকর্ষণকারী ভূষা। উত্তরীয় অবশ্য রাখতে হবে। হাত, মুখ, চোখের অভিনয়োচিত কিছু সুললিত ভঙ্গী থাকবে যাকে আংগিক বলা যেতে পারে। কথকতা বাক্যপ্রধান, কাজেই বাচিক অভিনয়ই এর সবচেয়ে কৃতিত্ব বহন করে। আর সব মিলিয়ে যে সাত্ত্বিক ভাব এতে উদিত হবে, তার ফলেই অষ্টসাত্ত্বিক ভাবলক্ষণ শ্রোতা ও পাঠকের মধ্যে ফুটে উঠবে ও সার্থকতার পথে উন্নীত হবে। তখন অশ্রু, কম্প, পুলক, স্বেদ, রোমাঞ্চ, বেপথুবৈবর্ণ, প্রলয় এগুলি কথক ও শ্রোতাদের মধ্যে দেখা যায়। শেষ অবস্থাটি সম্বন্ধে কথককে কিছু সংযত থাকতে হয়। শেষ অবস্থাটি তো প্রলয় বা মূর্চ্ছা। অনেক আসরে দেখা গেছে, এইরকম ভাবাবিষ্ট ভক্ত শ্রোতাকে সরিয়ে নিয়ে ডাক্তারী পরীক্ষা করে, হৃদস্পন্দন ব্লাডপ্রেসার এগুলির বিশেষ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা গেছে। সাধারণতঃ কিছুক্ষণ কানের কাছে নাম শুনিয়ে পূর্বাবস্থায় এঁদের ফিরিয়ে আনতে হয়। সীতারাম দাস ওঙ্কারনাথের এক প্রিয় শিষ্য মিলিটারী ক্যাপ্টেন ছিলেন। ক্যাপ্টেন এম্ এন্ রায় পরমভক্ত ছিলেন। ইনি কখনই আমার পাঠের আসরে আধ-ঘণ্টার বেশী শুনতে পারতেন না। তার আগেই অচৈতন্য হয়ে যেতেন। পাঠের শেষে জ্ঞান ফিরে এলে দেখা করতে আসতেন। অশ্রুপ্লাবিত নয়নে মাথায় দুহাত রেখে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলতেন। আমার সব শরীরের মধ্যে একটা বৈদ্যুতিক তরংগের মত খেলে যেতো। এসব এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা—প্রত্যক্ষ না হলে কাগজে লিখে বা মুখে বলে বোঝানো যাবে না।

১৯৮৪ সালে টরেন্টো ইউনিভার্সিটি কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে, 'লাভ সেন্টিমেন্ট অ্যান্ড ইটস স্পিরিচুয়াল ইমপ্লিকেশন ইন গৌড়ীয় বৈষ্ণবইজম্' শীর্ষক বক্তৃতা দিয়েছিলাম কথকতার স্টাইলে। সাউথ এশিয়ান সিরিজ, অকেশন্যাল পেপার নং ৩৫, সামার, ১৯৮৫। মিচিগান্ স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে 'বেঙ্গল বৈষ্ণবইজম, ওরিয়েন্টালিজম, সোসাইটি অ্যান্ড দি আর্টস' নামে একটি বক্তৃতা সংকলনও ছাপা হয়েছিল। সংকলনটির

সম্পাদক ডঃ যোশেফ টি ওকোনিল সম্পাদকীয় নোটে ওই বক্তৃতাটি সম্পর্কে লিখেছিলেন: "This somewhat larger and more formally arranged written version cannot duplicate the quality of evocative expression that Dr. Chaudhury achieved in her distinctive and exquisite—oral expression to the conference. There she deftly interwove *prose expression*, Sanskrit *recitation* and vernacular *Indian Songs* all conveyed with *apt facial expression, gestures* and *other dramatic embellishments*. The written version does however indicate structure, sources, theological content and, one might hope something of the poetic quality and fervor of this mode of Gaudiya Vaisnava discourse cum recital. এই যে "Discourse cum recital" অর্থাৎ কথকতার প্রয়োজনীয় অংগগুলি বলেই দেওয়া হয়েছে—(1) prose expression, Sanskrit recitation, Vernacular Indian Songs, apt facial expression, gestures, other dramatic embellishments. সংস্কৃত আবৃত্তি, তার ব্যাখ্যা, সংগীত (যদিও শুদ্ধ বাংলা গান নয়, প্রয়োজনবোধে এই সব গানের ইংরাজী অনুবাদ, হিন্দীতে অনুবাদ, সংস্কৃত গানও করে দেখেছি চিত্তাকর্ষক হয়), মুখচোখের ভঙ্গী, অভিনয়োচিত অংগগুলির ব্যবহার কথকতাকে রসোত্তীর্ণ করে।

এই গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি অন্যত্র বলেছেন : "Basanti Chaudhury demonstrated to the Conference a distinctive style of Gaudiya Vaisnava discourse cum recitation cum song. With her fine voice and meticulously modulated gestures and facial expressions she dramatised one esthetic subtlety and emotional power of devout love epitomised in Radha's passion of Krishna. She also sang a selection of devotional lyrics, Padavali Kirtan..... The volume begins with a written version of other elaboration in poetry and prose of eight phases of Radha's love for Krishna."

প্রফেসর ওকোনিলের এই যে প্রবন্ধের সমালোচনা তাতে মোটামুটি বোঝা যাচ্ছে কথকতার সার্থকতা বা রসপুষ্টি কিভাবে হতে পারে। সংস্কৃত আবৃত্তি—যে শাস্ত্রকে ভিত্তি করে কথার আরম্ভ প্রথমে মংগলাচরণের মাধ্যমে গুরুবন্দনা, কৃষ্ণ শিব গণেশ প্রভৃতি উপাস্য দেবতাদের বন্দনা, গৌর নিত্যানন্দ ও ছয় গোস্বামীর ও ভক্ত শ্রোতাদের বন্দনা করে নিতে হয়। সংস্কৃত, বাংলা, ইংরাজী যে ধরনের শ্রোতার সামনে উপস্থিত হবেন, সেটি অনুবাদ করেও নিতে পারা যায়। মূল গ্রন্থের সংস্কৃত শ্লোক অবশ্যই শুদ্ধ ও সুরে আবৃত্তি করতে হয় না হলে কথকতার গুরুত্ব হয় না। তারপর তার ব্যাখ্যার সময় পদ্যে প্রয়োজনীয় শাস্ত্রসিদ্ধান্ত, অন্যোক্তি, আবৃত্তি (যে কোন ভাষায়) করা হবে।

শেষে শ্রোতাদের জন্য কল্যাণ প্রার্থনায় সমাপ্তি হবে। সবসময় তৈরী থাকতে হবে কথকতার পরে শ্রোতাদের প্রশ্ন থাকলে যাতে তার সুষ্ঠু সমাধান করতে পারা যায়। শিক্ষকতার ক্ষেত্রে যেমন শিক্ষককে অনেক রকম প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে উত্তর দিতে হয়। এডিনবরো ইউনিভার্সিটিতে বক্তৃতার পর আমেরিকান ছাত্রছাত্রীরা ঘিরে এসেছে টেবিলের কাছে। জিজ্ঞাসা করছে—রাধাকৃষ্ণ তোমাদের উপাস্য। But it is illegal love. How do you reconcile? তাদের এই সন্দেহভাজনের জন্য আবার শুরু করতে হয়—আলোচনা। এই ধরনের নানা প্রশ্ন। এইরকম শাস্ত্র সিদ্ধান্ত সম্পর্কেও যেমন, তেমনই কারো ব্যক্তিগত, পারিবারিক সমস্যা সমাধান সম্পর্কেও প্রশ্ন আসে। অধিকাংশ শ্রোতারা ধরেই নেন, যিনি কথকতার আসনে বসেছেন, তিনি তাঁদের চেয়ে জ্ঞানবৃদ্ধ। যদি এমন কেউ থাকেন, তা না মনে করলেও প্রশ্ন করেই শুধু ব্যস্ত করতে চান, বিরক্তি প্রকাশ না করে যথাসম্ভব তার সমাধান করতে চেষ্টা করা উচিত। সংগীত নির্বাচনে আমি কীর্তন, বাউল, লোকসংগীত, রবীন্দ্রসংগীত, প্রাচীন বাংলা গান, ভজন সবরকমেই উদার। বিদেশে গানগুলিকে সেই ভাষায় অনুবাদ করে এবং সেই একই সুর বজায় রেখে গাওয়াতে শ্রোতাদের চিত্তরঞ্জন করার আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছিল। আমার তো মনে হয়, কথকসম্প্রদায়ের বিভিন্ন ভাষাগত দক্ষতা জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সাহায্য করে। ওকোনিলের ভাষায় 'facial expression' ও 'dramatic embellishment' এই দুটিই কথকতায় প্রয়োজনীয়। পাণ্ডিত্যপূর্ণ পাঠ কিছু পণ্ডিত শ্রোতাকে অনেকক্ষণ মুগ্ধ করে রাখতে পারে। কিন্তু একটি আসরে শ্রোতা তো নানারকম থাকেন। এই কথাটি মনে রেখে সকলের পক্ষে যাতে চিত্তহারী হয় সেজন্য কথকতার পক্ষে এগুলির প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়। কীর্তনে দোহাররা থাকেন, নানা যন্ত্রও থাকে কিন্তু কথকতা ওয়ান-ম্যান-শো। এখানে দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর সাহায্য ছাড়াই যাকে বলে নন-স্টপ-এক্টিভিটি-শো করে যেতে হয়। সেজন্য একজন কীর্তন গায়কের চেয়ে কথকের কাজ পরিশ্রমসাধ্য বেশী। প্রাসঙ্গিক উপাখ্যান—বর্তমান সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে তুলনামূলক আলোচনা থাকবে কিন্তু কখনই কাউকে আঘাত করার উদ্দেশ্য নিয়ে কিছু বলা হবে না। মনে রাখতে হবে, কথকতার মাধ্যমে জনশিক্ষার প্রসার ঘটানো যায়। শুধু ধর্মীয় উন্মাদনা নয়, নৈতিক চরিত্রের ওপর এর প্রচুর প্রতিফলন আছে। আমেরিকায় কোনো একজন শ্রোতার নিজমুখে উক্তি "একদিন এসে আমার বাড়ী পাঠের পর আপনি সমস্ত চরিত্র বদলে দিয়েছেন বলে আমি যে কি কৃতজ্ঞ বলতে পারি না।" উত্তরবংগে একজন মাড়োয়ারী ভদ্রলোক পাঠের পরদিন নিমন্ত্রণ করে বলেছিলেন, "আমি এক বছর ঘুমোতে পারিনি। মাতাজী—কাল পাঠ শুনে যাবার পর আমি একবছর বাদে ঘুমোতে পেরেছি।" এইরকম কতই না অভিজ্ঞতা হয় কতজনের জীবনে শ্রবণের মাধ্যমে। ১৯৯২ সালে আমেরিকার শিকাগো শহরে এক মুসলমান ডাক্তারের বাড়ীতে ভাগবত পাঠের আমন্ত্রণে গিয়েছিলাম। একজন মুসলমানের বাড়ী পাঠ করছি, এটা আমার

কথকতা জীবনের অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল। একজন বাঙালী ডাক্তার অশোক রায় ও একজন মহারাষ্ট্রী ভদ্রলোক ছাড়া সে সভায় সবাই আমেরিকান ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা ছিলেন। পাঠের পর একজন সাহেব গায়ত্রী মন্ত্রের ব্যাখ্যা শুনতে চাইলেন। এও এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা। একজন অভারতীয় শুনতে চাইছেন গায়ত্রী মন্ত্রের ব্যাখ্যা। এই ব্যাখ্যা শোনার পর আমাকে চিঠি লেখেন—"I have grasped the meaning of Gayatri. It has a tremendous effect on me." তিনি বলেছেন "আমি তোমার টেপের কপি আমার অনেক বন্ধুদের দিয়েছি। আর আমি গাড়ী চালাবার সময় শুনতে শুনতে যাই। I am not tired of it". সেখানে উপস্থিত ডাক্তার রায় জিজ্ঞাসা করেছেন—"আপনাদের বুঝতে কি কোনো অসুবিধা হয়েছে?" আসল কথা আমার উচ্চারণ বা Intonation তো আমেরিকানদের মতো নয়। তাঁরা বলেছেন, "না আমাদের বুঝতে কোনো অসুবিধাই হয়নি। উনি শুধু তো মুখে কথা বলছেন না, ওঁর সমস্ত শরীরটাই কথা বলছে। এইখানেই কথকতার সার্থকতা। যখন কথকতার আসনে উপবিষ্ট কথকের শুধু মুখই কথা বলে না। সমস্ত শরীর কথা বলে। ১৯৮৮ সালে বার্লিনে কথকতা করার সময় সভায় এমন কয়েকজন শ্রোতা ছিলেন—যাঁরা ইংরাজী বুঝতেন না, কিন্তু বুঝতে না পারলেও কিছু বুঝতে পারছেন কিনা জিজ্ঞাসায়—তাঁদের মধ্যে একজন মন্তব্য করেন খুবই কম বুঝেছেন—"Very little, but I have appreciated the spirit. যার জন্য দুঘণ্টা স্থির হয়ে বসেও ছিলেন। এই Spirit-টা কি? এটা হৃদয়ের ভাষা, আঞ্চলিক, প্রাদেশিক বা আন্তঃপ্রাদেশিক ভাষা নয়। লন্ডনের কেন্ট নিবাসী লুই স্টুয়ার্ট এই কথাই মন্তব্য করেছিলেন—"এটা হৃদয়ের ভাষা, Soul দিয়ে বুঝতে হয়। তাই এঁর বক্তব্য তো আমার কাছে কিছুই দুর্বোধ্য ঠেকে না। তবে আমি বাংলা শিখবো, সংস্কৃত দর্শন, ভক্তিশাস্ত্র পড়বো। আমি বর্ণপরিচয় পড়তে আরম্ভ করেছি।" এতেই ইনস্পায়ার্ড হয়েছেন। এই হোলো কথকতা। ফকরুদ্দীন আদমজীর ভাষায় I am not tired of it, কথকতা "ক্লান্তি বিহীন ফুল ফোটানোর খেলা।" যা কথক ও শ্রোতার চিত্তে অনির্বচনীয় মাধুর্য্য প্রভাব বিস্তার করে। □